মহাকাশ বিজয়ে মানুষ

সুমন পাটোয়ারী

www.pathagar.com

মহাকাশ বিজয়ে মানুষ

সুমন পাটোয়ারী

প্রকাশ ভবন
৬ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

www.pathagar.com

প্রকাশক
সেলিমা খান
প্রকাশ ভবন
৬ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ১৯৯০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
সুমন পাটোয়ারী

গ্রন্থ স্বত্ব : লেখক

মুদ্রণে
দি বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩/৪, পাটুয়াটুলী লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪৫·০০

MOHAKASH BIJOYE, MANUSH by Sumon Patoary, Published by Selima Khan, PROKASH BHABAN, 6, Parydash Road, Dhaka-1100, First Edition February, 1990, Price : 45·00 only.

www.pathagar.com

মহাকাশ বিজয়ে মানুষ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

অধ্যায়			পৃষ্ঠা
★ ১.	রকেটের কথা	... ...	১
★ ২.	মহাকাশের প্রথম উপগ্রহ	... ...	১০
★ ৩.	মহাকাশে প্রথম মানুষ		১৫
★ ৪.	চাঁদে যাওয়ার উপায়		২২
★ ৫.	নভোচারীদের অনুশীলন	... ...	২৮
★ ৬.	যাত্রার জন্য পরীক্ষাযান উড্ডয়ন	... ...	৩৩
★ ৭.	উড্ডয়নের জন্য প্রস্তুতি		৪১
★ ৮.	চাঁদের পথে যাত্রা	...	৪৯
★ ৯.	কল্পনার চাঁদে	...	৫৭
★ ১০.	পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন	...	৬৬
★ ১১.	চাঁদে আরো অভিযান	... ...	৭০
★ ১২.	মহাকাশের নতুন যুগ	... ...	৮০
★ ১৩.	স্পেস শ্যাটল (শ্যাটল রকেট)	... ...	৮৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

স্নেহময়ী মা, বাবা ও আজুমামাকে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বিজ্ঞানের শক্ত বিষয়কে সহজ, সরল ও সুন্দর করে তুলে ধরা বড় কঠিন কাজ। এমনটা অনায়াসে কেউ পারে না। লেখায় শক্ত হাত না থাকলে তা হয় না। বিজ্ঞানের জটিলতাকে সাহিত্যের সরলতায় টেনে আনতে দক্ষতা চাই। বিশেষ করে যখন বিষয়টিকে কিশোর উপযোগী করে তুলতে হয়, তখন ব্যাপারটি আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

আমার মনে হয় তরুণ লেখক সুমন পাটোয়ারী এই কঠিন কাজটি সার্থকভাবে করতে পেরেছেন। তিনি এখানে মহাকাশে মানুষের অভিযানের কথা খুব সহজ ভাষায় তুলে ধরেছেন। উড়োজাহাজ আবিষ্কারের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ মহাকাশ পথকে জয়যুক্ত করলো। কিন্তু তবুও মানুষের অজানাকে জানার আগ্রহ কমেনি। তারা চায় মহাকাশকে পুরোপুরি জয় করতে। এর কিছুটা সাফাল্যমণ্ডিত হলেও পুরোপুরি হতে কতদিন লাগবে কিম্বা আদৌও হবে কিনা তা বলা মুশকিলের ব্যাপার। মোটামুটি মানুষের চাঁদে যাওয়া পর্যন্ত এবং তার পরের কিছু ঘটনা লেখক এ বইয়ে ধারাবাহিক-ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এতসব আবিষ্কারের পেছনে যারা আছেন তাদের কথা এবং কিভাবে ধাপ অনুযায়ী রকেট, মহাকাশযান ইত্যাদি আবিষ্কৃত হল তা এই বইটিতে সহজ ও সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠক-দেরকে মহাকাশ অভিযান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়াই এখানে লেখকের মূখ্য উদ্দেশ্য। আশা করি যাদের জন্য বইটি লিখিত তারা উপকৃত হবে। পাঠকবৃন্দ বইটি সম্বন্ধে মতামত জানালে খুবই খুশী হব। ভবিষ্যতে এ ধরনের আরও গ্রন্থ প্রকাশের আশা রইল।

সেলিমা খান

www.pathagar.com

ভূমিকা

সৃষ্টির পর থেকেই মানুষ হাটতে শিখছে। এই হাটার মাধ্যমেই মানুষের অজানাকে জানার ও দেখার পদক্ষেপের সূচনা। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে একে একে ঘোড়ার গাড়ি আসল। ট্রেন, গাড়ি, স্টীমার আবিষ্কৃত হল। জল ও স্থল পথকে জয় করার পর রাইট ব্রাদার্স-এর উড়োজাহাজ আবিষ্কারের ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ আকাশ পথকে জয়যুক্ত করল। কিন্তু তবুও মানুষের অজানাকে জানার আগ্রহ কমেনি। তারা চায় মহাকাশকে পুরোপুরি জয় করতে। এর কিছুটা সাফল্য মণ্ডিত হলেও পুরোপুরি হতে কতদিন লাগবে কিংবা আদৌও হবে কিনা তা বলা মুশকিলের ব্যাপার। যাইহোক মোটামুটি মানুষের চাঁদে যাওয়া পর্যন্ত এবং তার পরের কিছু ঘটনা আমি এ বইয়ে ধারা-বাহিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। অতএব আবিষ্কারের পেছনে যাঁরা আছেন তাদের কথা এবং কিভাবে ধাপ অনুযায়ী রকেট, মহাকাশযান ইত্যাদি আবিষ্কৃত হল তা এই বইটিতে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি।

মহাকাশযানে যে রকেট ব্যবহার হয়, এর উন্নতির সাথে সাথেই মহাকাশ-যাত্রার জন্য মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে। তবে রকেট আবিষ্কৃত হয়েছিল যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে। এটাকেই মানুষ পরিবর্তন করে আরোও উন্নতমানের, উচ্চক্ষমতা-সম্পন্ন করে মহাকাশযাত্রার একক হিসাবে তৈরি করেন। রকেটের প্রধান কাজটি হলো মহাকাশযানটিকে মহাকাশে ছুঁড়ে দেয়া—যেখানে পৃথিবীর কোন আকর্ষণ নেই। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে এই রকেটের উন্নতি সাধনে মানুষের দু'হাজার বছর লেগেছে। সুতরাং বলা যায় মহাকাশে যাত্রার আশা মানুষের অনেক আগে থেকেই। এভাবেই মানুষের প্রচেষ্টার কথা এবং কিভাবে একে একে সবকিছু আবিষ্কার হলো তা এ বইতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আমাদের পক্ষে কবে সম্ভব হবে উপগ্রহ বা মানুষ মহাকাশে পাঠানো তা বলা মুশকিল। তবুও এ সম্বন্ধে সবারই জেনে রাখা প্রয়োজন বলে আমি এই বইটি রচনা করেছি। এ বইটি মূলতঃ তথ্যমূলক এবং অতি সহজ ভাষায় লেখার চেষ্টা আমি করেছি। বইটি পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা সংশোধন করার জন্য আমাকে জানালে আমি একান্ত অনুগত থাকব।

www.pathagar.com

বইটি লেখার জন্য আমি প্রথমে উৎসাহ পাই শ্রদ্ধেয় আজুমামা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলের বাংলার শিক্ষক মোঃ আবদুস সোবহানের কাছ থেকে। তিনি আমার অনুবাদের প্রশংসা করে প্রচণ্ড উৎসাহ দেন যার ফলে আমি বইটি লেখা শুরু করি।

বইটি প্রকাশনায় যিনি আমাকে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করলেন, তিনি হলেন নওরোজ কিতাবিস্তানের স্বত্বাধিকারী জনাব আবদুল কাদির খান সাহেব। তার প্রচেষ্টা, উৎসাহ এবং প্রচণ্ড খাটুনির ফলেই বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য সাহায্যকারী হাত, ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষিকা মিসেস নাদিরা পারভীন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ এবং একই বিভাগের শিক্ষক মোঃ ওদুদ ভূঁঞা, রিংকুমামা এবং ঢাকা ডেন্টাল কলেজের সারোয়ার ভাই যাঁদের অনুপ্রেরণা ছাড়া বইটি আমার পক্ষে লেখা সম্ভব হত না। তাঁদের কথা আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

প্রচুর সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বইটিকে সম্পূর্ণ মুদ্রণ প্রমাদ থেকে নিষ্কৃতি দেয়া গেল না বলে দুঃখিত। সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর আন্তরিক শুভেচ্ছা পেলে আগামী সংস্করণে বইটিকে আরও সুন্দর ও সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট হবো।

পরিশেষে সকলের সুখী ও সুন্দর জীবন কামনা করে শেষ করছি।

সুমন পাটোয়ারী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১

রকেটের কথা

পৃথিবী ছাড়িয়ে কিভাবে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাওয়া যায় এ নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মানুষের ভাবনার অন্ত ছিল না। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই যেন বিজ্ঞানীদের যাদুকাঠি ষাট বছরের মধ্যেই মানুষকে মহাশূন্যে নিয়ে পৌঁছলো। কিন্তু এ ষাট বছরের আবিষ্কারের পেছনে কাজ করেছে ২০০০ বছর ধরে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম। তাই এ বিষয়ে আলোচনা করতে হলে আমাদের যেতে হবে অনেক পেছনে।

এখনকার দিনে যে মহাকাশযানের ব্যবহার হয় তার প্রধান অংশ হচ্ছে রকেট। আর এও ঠিক যে রকেট বিদ্যায় উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেই মানুষ তার কল্পনার মহাকাশে পাড়ি দিতে পেরেছে। যদিও স্যার আইজাক নিউটনের সূত্রানুযায়ী ১৭শ' শতাব্দীতে রকেট বিদ্যার পত্তন হয়, তবুও এটা প্রায় দু'হারজার বছর আগেও জানা ছিল। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে Aulus Gellius নামে একজন বিজ্ঞানী একটি যান্ত্রিক রকেট তৈরীর কথা বলেন যে টার চালিকাশক্তি হিসাবে বাষ্পের জেট ব্যবহৃত হয়েছিল। এর চারশ' বছর পর আলেকজান্দ্রিয়ায় একজন গ্রীক বীর একটি গোলাকার বস্তুকে জেট দ্বারা ঘুরিয়ে Aulus Gellius-এর ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেন।

রকেট বিদ্যায়সুদূরে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে এগুলো ছিল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টার সমাবেশ। চীনারাই প্রথম একটি বস্তুকে বাতাসের মধ্যদিয়ে সুন্দরভাবে চলাচল করাতে সক্ষম হয়। তখন সবেমাত্র ইউরোপে খ্রীস্টানদের বসতি শুরু হয়েছে। চীনারা কতকগুলো রাসায়নিক বস্তুর সংমিশ্রণে প্রথম রকেট তৈরী করেন। প্রথমে এগুলো ছিল গোলাকার বস্তু বিশেষ।

সঠিক করে বলা মুশকিল ঠিক কখন এ আগুনের গোলাকৃতি বস্তুটি আগুনের তীরের আকৃতি পেল। কিন্তু যে ব্ল্যাক পাউডারটা তখন রকেটে ব্যবহার করা হত তা দুশ' শতাব্দীতেও মানুষের জানা ছিল। ব্ল্যাক পাউডার অবশ্য যুদ্ধের জন্যই

www.pathagar.com

আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রথমে কামানের গোলা এবং পরে তীরের আকৃতির রকেটের জন্য এটা ব্যবহৃত হত। এটা ছিল গন্ধক, সোরা ও কাঠকয়লার একটি মিশ্রণ বিশেষ।

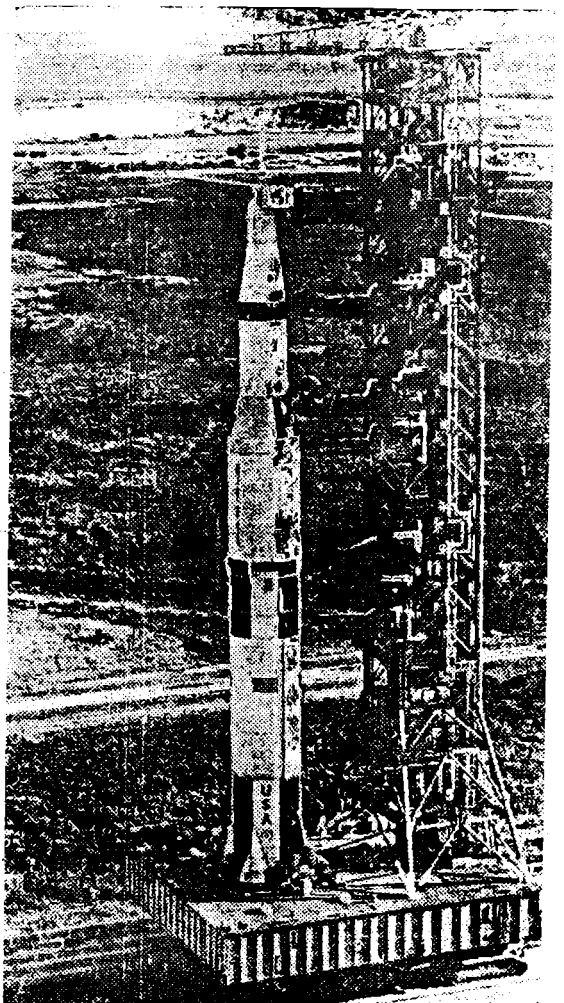

তিন ধাপ রকেট (তিন নভোচারী এ রকেটটি দিয়েই প্রথম চাঁদে যান)।

www.pathagar.com

রকেট বিদ্যার উন্নতির জন্য প্রথম সচেষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেন CONRAD HASS। তিনি রুমানিয়ার সিবিউতে ১৫২৯ থেকে ১৫৬৯ সাল পর্যন্ত গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান ছিলেন।

হ্যাস সর্বপ্রথম বহুতলবিশিষ্ট রকেটের সুবিধাসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। বহুতল রকেটে এক একটি তল পুড়ে যাওয়ার পর থেকে তার ওজন কমে যাওয়ার ফলে তার গতিবেগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। প্রথম ধাপটি যখন পুড়ে শেষ হয়ে যাবে তখন তার মোটা কাগজ ও দ্রব্যাদিও পুড়ে খসে যাবে। ফলে ওজন কমে যাবে এবং রকেটটিও দ্রুত চলবে। আর প্রথম ধাপের তাপটি গিয়ে দ্বিতীয় ধাপকে জ্বালিয়ে দেবে। ফলে দ্বিতীয় ধাপটি আরোও দ্রুত চলতে থাকবে। হ্যাস তার পরিকল্পনাকে রূপদানের জন্য কতকগুলো নকশা অংকন করেন। তিনি রকেটের মাথায় একটি খালি যায়গা চিহ্নিত করেন যাতে কিছু ওজন রাখা যায়। এটাকে তিনি PAY LOAD নামে আখ্যায়িত করেন। হ্যাস তিনতলবিশিষ্ট রকেট ও মিলিটারি যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য রকেটের নক্শা করেন যার নাকের মধ্যে গোলাবারুদ রাখার জায়গাও তিনি চিহ্নিত করেন। তার প্রধান চিন্তা ছিল কিভাবে অভ্যন্তরীণ ভর কমিয়ে রকেটকে দ্রুততর বেগ দেয়া যায়। এরপর কঠিন জ্বালানি রকেটের বড় ধরনের উন্নতি সাধন করেন উইলিয়াম কন্‌গ্রিভ নামে একজন কর্ণেল। ১৮০৪ সালের বিভিন্ন তথ্যের উপর নির্ভর করে তিনি কঠিন জ্বালানি রকেটের নানারূপ নক্শা তৈরী করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে রকেট যেন সম্পূর্ণরূপে গোলন্দাজদের ব্যবহারের অস্ত্রে পরিণত হয়। কনগ্রিভের রকেট যখন বৃটেনের বাজারের তুঙ্গে তখনই একজন রাশান স্কুলটিচার রকেট বিদ্যার এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। আর তার এ সৃষ্টির ফলেই ভবিষ্যতের আবিষ্কারের এক সুদৃঢ় পদক্ষেপের সূচনা হয়।

সেই স্কুল টিচারটির নাম ছিল কন্‌স্তানতিন এডুয়ারডোভিচ তিসোলকোভস্কি। তিনি ১৮৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাকেই "মহাকাশ যাত্রার জনক" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তিনি কখনও ছোটখাট বিষয় নিয়ে চিন্তা করতেন না। তাঁর লক্ষ্যই ছিল কিভাবে মানুষকে মহাকাশে পাঠানো যায় তা আবিষ্কার করা। তাঁর আগের সকল বিজ্ঞানীই একটি জিনিষ ভুল করে ছিলেন। সেটি

www.pathagar.com

হল তাঁরা ভাবতেন যে রকেট শুধু বায়ুমণ্ডলের ঘন বাতাসকে ধাক্কা দিয়েই সামনে এগিয়ে চলতে পারে। কিন্তু মহাশূন্যে তো বাতাস নেই ওখানে রকেট চলবে কি করে? তিসোলকোভস্কিই প্রথম প্রমাণ করেন যে, রকেট মহাশূন্যেও চলতে পারবে।

তিসোলকোভস্কি জানতেন যে একটি রকেটযানের নক্‌শা করতে গেলে জানা প্রয়োজন রকেটটি ঠিক কত জোরে চলবে। সেজন্য আবার রকেটের ভেতরে যে কঠিন জ্বালানি দেয়া হয় তার কার্যক্ষমতাও জানা প্রয়োজন। খুব উচচ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানি রকেটে ব্যবহার করার ব্যাপারে তিনি বেশ সচেতন ছিলেন। কারণ এতে রকেটযানের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার ক্ষতি হতে পারে। এরপর তিসোলকোভস্কি যেন একটু বেশি সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেন। তিনি একসাথে দুটি তরল জ্বালানি—তরল অক্সিজেন এবং তরল হাইড্রোজেন রকেটে ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি প্রদান করেন। এ দুটি একত্রে মেশানোর পর পোড়ানো হলে গ্যাস উৎপন্ন হবে তা রকেটের পেছন দিয়ে প্রচণ্ডবেগে নির্গত হলে তাতে রকেট অতি সহজেই সামনে এগিয়ে যেতে পারবে।

তিসোলকোভস্কির এ দুটি তরলের মিশ্রণ রকেটের উন্নতির ক্ষেত্রে ছিল এক বিশাল পদক্ষেপ। এতে মানুষের মহাকাশ ভ্রমণের নিশ্চয়তা যেন আরো বেড়ে গেল।

কিন্তু তখন পর্যন্ত কেউই তরল জ্বালানি রকেট চালাতে সক্ষম হয়নি। তিসোলকোভস্কি যে তরল দুটির কথা বলেছিলেন সেগুলো বানানো ছিল তখনকার জন্য এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ অক্সিজেন ফুটে — ১৮৩° সে. তাপমাত্রায়। এত নিচে তাপমাত্রা নামানোর উপায় তখন জানা ছিলনা। কঠিন জ্বালানি রকেট অপেক্ষা তরল জ্বালানি রকেট অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু অসুবিধা হল এ অতীব ঠাণ্ডা (CRYOGENIC) তরলগুলোকে নাড়াচাড়া ও সংরক্ষণ করা। আবার গ্যাস হিসাবে যদি রকেটে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন ব্যবহার করা হয় তবে রকেটের গ্যাস চেম্বারের আয়তন অত্যাধিক বড় করতে হবে। তাই তিসোলকোভস্কির তরল দুটি ব্যবহার করার জন্য সবাই পছন্দ করলেন।

তখনও আবার অনেকে কঠিন জ্বালানি রকেটের উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করছিলেন। তিসোলকোভস্কি অন্য কোন পথে না গিয়ে সরাসরি নিজের পথেই চললেন। তার বয়স যখন ১৫ বছর তখন তিনি রকেটের সমস্যাদির ওপর মনোনিবেশ করেন, ২১ বছর বয়সে তিনি মহাকাশ যাত্রার জন্য রকেট ব্যবহারের

www.pathagar.com

পরামর্শ দেন এবং ১৯০২ সালে তার বয়স যখন ৪৫ তখন তিনি সর্বপ্রথম তরল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন একত্রে করে তরল জ্বালানি রকেট তৈরীর কথা বলেন। এর এক বছর পর তার সমস্ত নক্শা, মতামত ইত্যাদি মিলিয়ে "Explrotion of outer space with reactive devices" নামে একটি বই লেখেন। তার আরোও কিছু কিছু লেখা ১৯১০, ১৯১১, ১৯১২ ও ১৯১৪ সালে বের হয়েছিল।

যদিও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে তরল জ্বালানি রকেটের সমস্ত নকশা তিসোলকোভস্কির কলমের আচড় থেকে এসেছিল, তবুও প্রথম তরল জ্বালানি রকেট তৈরীর কৃতিত্ব পেয়েছিলেন অনেক দূরের দেশের একজন বিজ্ঞানী। তার নাম হল রবার্ট হ্যাচিংস গডার্ড। তিনি ১৮৮২ সালের ৫ই অক্টোবর উত্তর আমেরিকার ম্যাসেচুসেট্স-এর WORCHESTER গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবকাল থেকেই গডার্ড এইচ. জি. ওয়েলস এবং জুলভার্নের বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাসগুলোর বেশ ভক্ত ছিলেন। তার বয়স যখন ১৪ বছর তখন তিনি মহাকাশে ন্যাভিগেশন-এর ওপর একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি তিসোলকোভস্কির মতের সাথে একমত হয়ে তরল জ্বালানি রকেটকে মহাকাশ যানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি পরে বলেছিলেন যে ১৭ বছর বয়সে একদিন তিনি যখন চেরী ফুল গাছের ওপর উঠে মরা ডালপালা ছাড়ছিলেন তখন হঠাৎ তার খেয়াল হয়েছিল "কত মজার হত যদি এমন একটি জিনিষ তৈরী করা যেত যা তাকে মঙ্গলগ্রহে নিয়ে যেতে পারত। আর এটা যদি তার পায়ের কাছের তৃণভূমি থেকে ছোড়া হত তাহলে এত কাছাকাছি থেকে কেমন দেখাত?"

ড: রবার্ট গডার্ড, তিনি প্রথম তরল জ্বালানি রকেট আবিষ্কার করেন।

www.pathagar.com

গডার্ড তরল জ্বালানি রকেট নিয়ে কাজ করে ১৯১১ সনে ক্লার্ক ইউনিভার্সিটি থেকে Ph. D. ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর ১৯১৯ সালে তিনি স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট-এ একটি পত্র পাঠান। পত্রটির মধ্যে কিভাবে চাঁদে যাওয়ার জন্য একটি পরীক্ষাযান তৈরী করা যায় তিনি তা লিখেছিলেন। এ ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় পদার্থবিদ্যার এ প্রফেসর ১৯২৬ সালে পৃথিবীর প্রথম তরল জ্বালানি রকেট তৈরী করেন। এ সাধারণ রকেটে একটি COMBUSTON CHAMBER এবং একটি জ্বালানি ট্যাংক ছিল। এ দুটি একটি পাইপ দ্বারা যুক্ত ছিল। এ পাইপটি ব্যবহৃত হয়েছিল জ্বালানি ও অক্সিডাইজার প্রবাহিত হওয়ার জন্য।

তিসোলকোভস্কির মত গডার্ডও জানতেন যে, তরল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণই তরল জ্বালানি রকেটের মোটরের জন্য সবচেয়ে উন্নতমানের জ্বালানি। কিন্তু গডার্ড তার রকেটে গ্যাসোলিন ও তরল অক্সিজেন ব্যবহার করেন। এগুলোও একটি উন্নতমানের মিশ্রণ এবং এদের অতি সহজে সংরক্ষণ ও নাড়াচাড়া করা যায়। আবার তিসোলকোভস্কির মতামতের প্রমাণের জন্য এ মিশ্রণটিও যথেষ্ট ছিল। ১৯২৬ সালের ১৬ই মার্চ গডার্ড প্রথমবারের মত তার রকেটটিকে উৎক্ষেপণ করেন ম্যাসেচুসেটসের AUBORN-এর নিকট একটি খামার বাড়ি থেকে। রকেটটি আড়াই সেকেণ্ড ধরে বায়ুতে উড়েছিল। কিন্তু গডার্ড কোন মুভি ক্যামেরা দিয়ে রকেটটির উড্ডয়নকালটি ধরে রাখেননি বলে আমরা পৃথিবীর প্রথম তরল জ্বালানি রকেটকে উড়তে দেখা থেকে বঞ্চিত হই।

এর প্রায় পাঁচ বছর পর ১৯৩১ সালের ১৪ই মার্চ জোহান্স উইন্ কলার নামে একজন নন্‌আমেরিকান একটি তরল জ্বালানি রকেট বানিয়ে উৎক্ষেপণ করেন। তার বানানো রকেটটি ষাট মিটার পর্যন্ত উঠেছিল। রকেটটির জ্বালানি হিসাবে জোহানস্ উইঙ্কলার তরল অক্সিজেন ও মিথেন ব্যবহার করছিলেন। এর ঠিক দুবছর পর AMERICAN INTERPLANETORY SOCIETY (এটা পরে হয় আমেরিকান রকেট সোসাইটি এবং ১৯৬৩ সাল থেকে এটার নামকরণ করা হয় "আমেরিকান ইন্‌স্টিটিউট অব্ অ্যারোনটিকস এণ্ড অ্যাস্ট্রনকিসাস" হিসাবে) তাদের তৈরী একটি তরল জ্বালানি রকেট উৎক্ষেপণ করেন। তারা গ্যাসোলিন ও তরল অক্সিজেন এই রকেটে ব্যবহার করেছিলেন। এরই মধ্যে জার্মানীতে কিছু বিজ্ঞানী মিলে একটি সোসাইটি

www.pathagar.com

গঠন করেন। তারা এটির নাম দেন "GERMAN SOCIETY FOR SPACE TRAVEL" এ সোসাইটির বিজ্ঞানী দলের মধ্যে একজন বিজ্ঞানী ছিলেন যার চেতনা আবিষ্কার ও অধ্যবসায়ের ফলেই মানুষ উন্নততর রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে পাড়ি দিতে পেরেছে—পেরেছে মহাশূন্যের অন্য জগতে পদচিহ্ন অংকন করতে। তার নাম ওয়ারনার ভন ব্রাউন। তিনি ১৯১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। যুবক ভন ব্রাউনের একমাত্র ইচ্ছা ছিল একটি রকেট তৈরী করা যা মানুষকে চাঁদে পৌছে নিয়ে যেতে পারবে।

ওয়ার্নার ভন ব্রাউন তিনি V_2 রকেটের নির্মাতা এবং তার বানানো রকেট দিয়েই কলিন্স, অলড্রিন ও আমস্ট্রং চাঁদের পথে পাড়ি জমান।

১৯৩৫ সালের মধ্যে জার্মানীর এ বিজ্ঞানীদের দলটা অনেক এগিয়ে যায়। তারা এরই মধ্যে নানারূপ মিলিটারি মিসাইল বানানো ও পরীক্ষা শুরু করেন। আবার এদিকে অনেক দূরে রাশিয়াতেও রকেট তৈরীর তোড়জোড় চলছিল। তারা খুব সঠিকভাবে তরল জ্বালানি রকেট 07কে উৎক্ষেপণ করেন ১৯৩৩ সালের ১৭ই আগস্ট। কিন্তু সাধারণ তরল জ্বালানি রকেট বানিয়ে উৎক্ষেপণ করা এক কথা আর মিলিটারি ব্যালাস্টিক মিসাইল বানানো—যাকে হয়তো ১টন ওয়ারহেড নিয়ে হাজার হাজার কিলোমিটার উড়ে যেতে হবে সম্পূর্ণ আলাদা কথা। কিন্তু জার্মান বিজ্ঞানিগণ ১৯৩০ হতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত খেটে অবশেষে ১৯৪২ সালের ৩রা অক্টোবর একটি ব্যালাস্টিক মিসাইল A—4 কে সার্থকভাবে উড্ডয়ন করাতে সক্ষম হয়। তারা এ মিসাইলটিকে উৎক্ষেপণ করেন বাল্টিক উপ-সাগরের তীরে অবস্থিত তাদের কার্যক্ষেত্র 'পিনেমান্ডে' হতে। এ মিসাইলের ওজন ছিল পঁচিশ টন এবং এর উচ্চতা ছিল ১৪ মিটার। এ মিসাইলটিতে জ্বালানি হিসাবে তরল অক্সিজেন ও অ্যালকোহল ব্যবহৃত হয়েছিল। এ সঠিক উড্ডয়ন দুই মহাদেশের বিজ্ঞানীদের মাঝে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করে।

www.pathagar.com

এ A—4 মিসাইলটি পরে V-2 রকেট (REVENGE WEAPON-2) নাম ধারণ করে। কিন্তু জার্মানীরা ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরের আগ পর্যন্ত এ রকেটটি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারেনি। হিটলার ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে V-2 এর সাহায্যে প্রথম ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করেন। তবে তার কিছুদিন পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে V-2 রকেটের ডিজাইনার ও নির্মাতা ছিলেন ভন ব্রাউন। যুদ্ধ যখন প্রায় শেষ তখন আমেরিকান সৈন্যরা পিনেমান্‌ডে দখল করে নেয় এবং ভন ব্রাউন ও তাঁর সহকর্মীদের আটক করে। ভন ব্রাউন আমেরিকার জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুক্তি পান এবং তিনি তাঁর দলবল নিয়ে আমেরিকার পথে যাত্রা করেন। অবশ্য এরই মধ্যে রাশান আর্মিরাও পিনেমান্‌ডেতে আসে কিন্তু ততক্ষণে আমেরিকান সৈন্যরা ভাল ভাল বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে গেছে। উপায়ন্তর না দেখে রাশানরা অন্য ইঞ্জিনিয়ারদের ধরে রাশিয়ায় নিয়ে যায়। অর্থাৎ এরপর দুদেশেই জার্মান বিজ্ঞানীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নানাবিধ খ্যাতি অর্জন করে।

আমেরিকানরা ভন ব্রাউনসহ প্রায় একশ ইঞ্জিনিয়ারকে ধরে নিয়ে গিয়ে টেকসাসের ফোর্ট ব্লিস-এ পুনর্বাসিত করে। আমেরিকায় তাদের প্রথম কাজ-ছিল টেকসাসের "হোয়াইট সেণ্ডস গ্রুভিং গ্রাউণ্ড"-এ একটি ফায়ারিং রেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত করা। গডার্ড ১৯৪৫ সালের আগস্টে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যে স্থানে রকেটের উন্নতির জন্য তার জীবনের বেশির ভাগ সময় ব্যয় করেছিলেন সে "রসওয়েল" জায়গাটি এ ফায়ারিং রেঞ্জ-এর খুব কাছাকাছি ছিল। এ স্থানে কর্ণেল হলজার এন টফটয়-এর অধীনে জার্মান বিজ্ঞানিগণ ব্যালাসটিক মিসাইল তৈরীর কাজে তাদের মনোনিবেশ করেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলিগণ-এর প্রধান লক্ষ্য ছিল মহাশূন্যে পাড়ি দেয়ার জন্য রকেট তৈরী করা, কিন্তু পুরোপুরি ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক কারণে তাদের ব্যালাস্টিক মিসাইল তৈরী করতে বাধ্য হতে হয়।

আমেরিকানরা প্রথম V-2 রকেট উৎক্ষেপণ করে ১৯৪৬ সালের ১৬ই এপ্রিল। এরপর জার্মান বিজ্ঞানীদের দলটিকে মেক্সিকো থেকে সরিয়ে অ্যালীবামার "রেড-স্টোন আরসেনালে" নিয়ে যাওয়া হয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণরূপেই গোলন্দাজের অধীনে চলে যায়। এ ভাবেই তারা যুদ্ধঅস্ত্র হিসাবে নানারূপ ব্যালাস্টিক মিসাইল তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। ১৯৫৫ সালে তাদের তৈরী ব্যালাস্টিক

www.pathagar.com

মিসাইল জুপিটারের রেঞ্জ ছিল ২৬০০০ কিলোমিটার। এভাবেই তারা V-2 -এর অন্যরূপ হিসাবে রেডস্টোন, জুপিটার, থর, অ্যাটলাস, টিটান প্রভৃতি ব্যালাস্টিক মিসাইল তৈরী করেন।

অবশ্য এরই মধ্যে তারা মহাশূন্যে যাওয়ার কল্পনাও করেছিলেন। তিনস্টেজ (তিন ধাপ) রকেট যখন উপগ্রহ মহাশূন্যে পাঠানোর সমস্যা দূর করল তখন তারা মহাশূন্যে পাঠানোর জন্য উপগ্রহের নক্‌শা করতে আরম্ভ করলেন।

নানারূপ ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যাদির সাহায্যে তারা উপগ্রহ তৈরী করলেন যেগুলো নিজে নিজে কাজ করতে সক্ষম। এ উপগ্রহগুলোর গায়ে তারা নানারূপ 'সোলার সেল' (Soler Cell) জুড়ে দিলেন। এ সোলারগুলো সূর্যের আলো থেকে তাপ গ্রহণ করে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে তা উপগ্রহের অভ্যন্তরীণ ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যাদির বিদ্যুতের চাহিদা মিটিয়ে দেয়, ফলে সেগুলো স্বয়ংক্রিয়-ভাবে চলতে পারে।

তাছাড়া বিজ্ঞানীরা উপগ্রহটিকে মাটি থেকে কন্ট্রোল করার জন্য একটি মজার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উপগ্রহটি মহাকাশে যে স্থানে আছে সে অবস্থানটি জানানোর জন্য সিগন্যাল পাঠায়। এ সিগন্যালটি "কন্ট্রোল সেন্টারে" বসানো অ্যান্টিনার সাহায্যে টিভির পর্দায় ছোট্ট আলোর গোলক হিসাবে ধরা দেয়। এছাড়া একই সময়ে আবার কম্পিউটারেও এ সিগন্যাল ধরা পড়ে। ইঞ্জিনিয়ারগণ কম্পিউটার এবং টিভি স্ক্রীন দুটি দেখে নিয়ে বুঝতে পারেন সব ঠিক আছে কিনা। আর যদি এতে কোন ভুল ধরা পড়ে তবে তারা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে সে ভুলটিকে সারিয়ে নিতে পারেন। রিমোট কন্ট্রোল মানে হল দূর থেকে কোন কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করা। এভাবেই তারা একটি স্বয়ংক্রিয় উপগ্রহ নির্মাণ করেন।

অবশেষে ১৯৫৭ সালে রাশিয়া এবং আমেরিকা উভয়েই মহাশূন্যে উপগ্রহ পাঠানোর জন্য প্রস্তুত হয়। উভয়ের মনে একটি বড় আশা ছিল প্রথম মহাশূন্যে উপগ্রহ পাঠানোর সম্মান অর্জন করবে। রাশিয়াই এ সম্মানটি অর্জন করে।

---

www.pathagar.com

২

মহাকাশের প্রথম উপগ্রহ

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর ভোরবেলা রাশিয়া পৃথিবীর প্রথম উপগ্রহ 'স্পুটনিক ওয়ান' মহাকাশে ছাড়ার সম্মান অর্জন করে। উপগ্রহটি খুবই ছোট ছিল। পরিধি ছিল মাত্র ৬০ সেন্টিমিটার এবং ওজন ছিল ৮২ কিলোগ্রাম। একটি 'তিনস্টেজ' রকেটের মাথায় উপগ্রহটিকে বসানো হয়। রকেটটি উড়ার পর

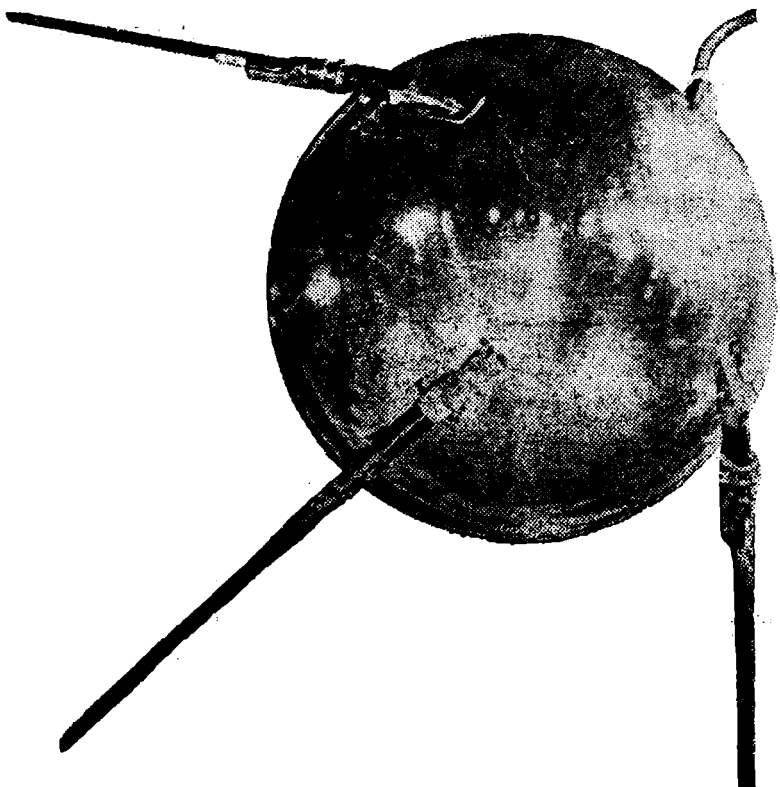

'স্পুটনিক ওয়ান' : মহাকাশের প্রথম উপগ্রহ।

www.pathagar.com

এক একটি ধাপ পুড়ে যাওয়ার ফলে এটার গতিবেগ আরোও বাড়তে থাকে। অবশেষে তৃতীয় ধাপটি এ উপগ্রহটিকে বায়ুমণ্ডলের বাইরে ঠেলে দেয়। যখন উপগ্রহের গতিবেগ পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির সাথে একটি সামঞ্জস্যে আসে তখন এটা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে তার নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরতে শুরু করে।

পৃথিবীকে কেন্দ্র করে কক্ষপথে ঘোরার সময় উপগ্রহটি অনেক অজানা এবং অতীব দরকারী তথ্য সংগ্রহ করে। ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রগুলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে দূরের স্তরে বায়ুর ঘনত্ব নির্ণয় করে। তারপর স্পুটনিক রাশিয়ার রেডিও স্টেশনে এ সকল তথ্য প্রচার করতে শুরু করে।

বিজ্ঞানের এ বিস্ময়কর অবদান সারা পৃথিবীকে অবাক করে দেয়। প্রথমে আমেরিকার অনেকেই বিশ্বাস করেনি যে রাশিয়া মহাশূন্যে উপগ্রহ পাঠিয়েছে। তারা ভেবেছিল রাশিয়া হয়তো বা মিথ্যা প্রচারণা করছে।

কিন্তু রাশিয়া খুব শিঘ্রই পৃথিবীর জনগণকে আরেকটা খবর দিয়ে চমকিয়ে দেয়। একমাস যেতে না যেতেই তারা তাদের দ্বিতীয় উপগ্রহ 'স্পুটনিক-২'কে উৎক্ষেপণ করে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল যে, এ উপগ্রহটি 'লাইকা' নামে একটি কুকুরকেও সঙ্গে করে নিয়ে যায়। এরই মধ্যে রাশিয়া একজন মানুষকে মহাশূন্যে পাঠানোর চিন্তা করছিল। কিন্তু তারা তখনও একজন মানুষের জীবনকে অনিশ্চয়তায় ফেলতে চাচ্ছিল না। মহাশূন্য সম্বন্ধে তাদের আরো জানা প্রয়োজন ছিল। তাই তারা একটি জীবন্ত প্রাণীর কি কি ক্ষতি হতে পারে তা দেখার জন্য প্রথমে একটি কুকুরকে মহাশূন্যে পাঠায়।

এ পরীক্ষাটি অনেক অজানা রহস্যের সমাধান মানুষের কাছে তোলে ধরে।

আমেরিকার উপগ্রহ পাঠানোর প্রথম প্রচেষ্টা বিফল হয়। লাখো লাখো মানুষ টিভি সেটের সামনে বসে রকেটটির উড্ডয়ন পর্যবেক্ষণ করছিল। কিন্তু তাদের নিরাশ হতে হয়, কারণ রকেটটি কয়েক মিটার উপরে উঠেই মাটিতে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

আমেরিকা এক সপ্তাহ পর আবার উপগ্রহ পাঠাতে চেষ্টা করে। অবশ্য এবার কিন্তু তারা সফল হয়। তারা 'এক্সপ্লোরার ওয়ান' নামে একটি ছোট উপগ্রহকে পৃথিবীর চারদিকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঠেলে দেয়। এ উপগ্রহটি একটি খুব দরকারী তথ্য সংগ্রহ করে। তাহল বায়ু মণ্ডলের পর একটি মারাত্মক 'রেডিয়েশন বেল্ট' পৃথিবীকে ঘিরে আছে। বিজ্ঞানীরা এ রেডিয়েশন বেল্টের নামকরণ করেন ভ্যান হেলেন বেল্টস' হিসাবে। সূর্য খুব ক্ষুদ্র হাইড্রোজেনের

www.pathagar.com

কণা বিকিরণ করে। এগুলো অত্যন্ত দ্রুতবেগে চারদিকে প্রবাহিত হয়। এ কণাগুলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে পারে না, কারণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এগুলোকে বাধা প্রদান করে। কিন্তু মহাশূন্যে তো কোন বাধা নেই অতএব এ বিকিরণ মহাশূন্যে খুব মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। এ আবিষ্কারটি ছিল খুবই প্রয়োজনীয় আবিষ্কার। কারণ নভোচারিগণকে অবশ্যই এই রেডিয়েশন বেল্টের ভেতর দিয়েই মহাশূন্যে পাড়ি জমাতে হবে। এরপর আমেরিকানরা আরও তিনটি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠায় এবং এগুলোর সাহায্যে এ বিকিরণ জীবন্ত শরীরের কি কি ক্ষতি করতে পারে এবং কিভাবে এটা হতে রক্ষা পাওয়া যায় তা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন।

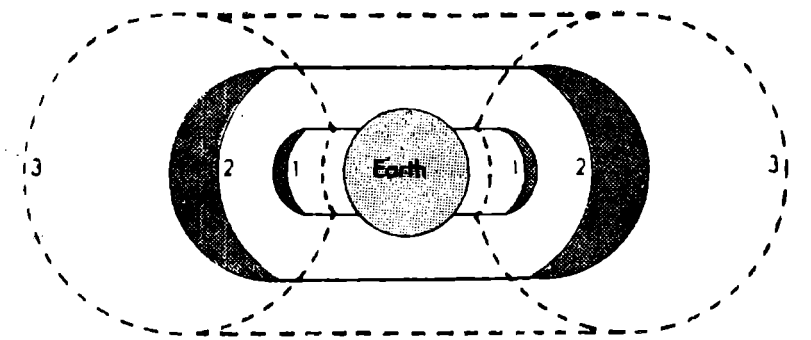

'ভ্যান হ্যালেন বেল্ট' 1 এবং 2 হল এ বিকিরণ বেল্টের ঘন অঞ্চল এছাড়া 3 নং জায়গাটিতেও বিকিরণ হয়।

আমেরিকা এবং রাশিয়া উভয়েরই পরবর্তী ইচ্ছা ছিল মানুষবিহীন একটি নভোযানকে চাঁদে পাঠানো। এজন্য তারা এক প্রকার যান ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেন। এগুলোকে 'প্রোব' বলে। এ কাজের জন্য কোন উপগ্রহ ব্যবহার করা যায় না। কারণ উপগ্রহের তো কোন যান্ত্রিক ক্ষমতা নেই। একটি উপগ্রহ শুধু কোন এক কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে পারে, কিন্তু সেটা তার কক্ষ পরিত্যাগ করে মহাশূন্যের কোথায়ও পাড়ি জমাতে পারে না। একটি উপগ্রহ তার কক্ষপথে অনেক বছরের জন্য রয়ে যায়। এরপর আস্তে আস্তে এটার গতিবেগ কমতে থাকে এবং এটি পৃথিবীর আরো কাছের এক কক্ষ পথে পড়ে যায়।

www.pathagar.com

আর যত নিচের কক্ষপথে এটি পড়তে থাকে তত দ্রুত হয় এর পড়ার বেগ। অবশেষে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পড়ে গিয়ে ঘর্ষণের ফলে পুড়ে ছাই অথবা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। একটি প্রোব-এর যান্ত্রিক ক্ষমতা থাকে তাই—এটা মহাশূন্যের একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্বাধীনভাবে পাড়ি জমাতে পারে, এটা যে-কোন জায়গাতেই যেতে পারে।

এখন দেখা যাক কিভাবে একটি প্রোব চাঁদের পথে পাড়ি জমায়। উপগ্রহের মত এটি প্রথম পৃথিবীর চারদিকে কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। এরপর প্রোবটিকে অবশ্যই পৃথিবীর আকর্ষণ হতে মুক্ত হতে হবে। তাই এটা তার যান্ত্রিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে গতিবেগ বৃদ্ধি করতে থাকে। প্রোবটির গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় চল্লিশ হাজার কিলোমিটার না হওয়া পর্যন্ত এর গতিবেগ বাড়তেই থাকে। তারপর এর পাওয়ার কেটে যায়। কিন্তু তখন প্রোবটিকে টেনে রাখার মত আকর্ষণ পৃথিবীর থাকে না। তাই এটা সহজেই চাঁদের পথে পাড়ি জমাতে পারে। প্রোবটি এরপর একই গতিবেগে চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত এটার গতিবেগের সাথে চাঁদের আকর্ষণের একটি সামঞ্জস্যের সৃষ্টি না হয়। তারপর এটা চাঁদের চারদিকে নিজ কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। অথবা এটা গতিবেগ কমিয়ে চাঁদে অবতরণও করতে পারে।

আমেরিকানরা সর্বপ্রথম চাঁদে পাঠানোর জন্য একটি প্রোব তৈরী করে। কিন্তু তাদের চেষ্টা সফল হয়নি। রকেটটি আকাশে উঠে যাওয়ার পর ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর আমেরিকানরা আরো তিনবার চেষ্টা করে কিন্তু তবুও তারা কোন বারই সফল হতে পারেনি।

তারপর রাশানরা চেষ্টা করল, এখানে বলতে হবে রাশানদের ভাগ্য অনেক সুপ্রসন্ন ছিল। তারা লুনিকা এক, দুই ও তিন নামে তিনটি প্রোব উড্ডয়ন করে। এদের মধ্যে প্রথমটি পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে মহাশূন্যে পৌঁছে ঠিকই কিন্তু সেটা চাঁদে না পৌছিয়ে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। দ্বিতীয়টি চাঁদের মাটিতে অবতরণ করে কিন্তু সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যায়। এটা কি কোন দুর্ঘটনা ছিল কিনা তা কোন রাশানরাই সঠিকভাবে বলতে পারেননি। তৃতীয় প্রোবটি চাঁদের চারদিকের একটি কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। এটা সর্বপ্রথম খুব কাছ থেকে চাঁদের ছবি তোলে পৃথিবীতে প্রেরণ করে।

সাফল্য : এখন বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন যে চাঁদে মানুষ পাঠানো সম্ভব।

www.pathagar.com

এরপরের সবচেয়ে দুঃসাহসিক অভিযান হল মহাশূন্যে মানুষ পাঠানো। আর এ সম্মান অর্জন করার জন্য আমেরিকা ও রাশিয়া উভয়েই প্রতিযোগিতা শুরু করে। কিন্তু মহাকাশের দৌড়ে রাশিয়া আমেরিকা থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। ফলে আমেরিকানদের রাশানদের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারার কথা নয়।

এরই মধ্যে রাশানরা নানারকম বড় বড় নভোযানের নক্শা তৈরী করতে থাকেন যাতে ওগুলোতে নভোচারীদের নিয়ে যাওয়া যায়। এরপর তারা অনেক কুকুরকে মহাশূন্যে পাঠিয়ে প্রোবগুলোকে পরীক্ষা করে। সেখানে মাত্র একটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এছাড়া বাকি সব নভোযানই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে খুব নিরাপদেই পৃথিবীতে অবতরণ করে।

১৯৬০ সাল নাগাদ রাশানরা মহাশূন্যে মানুষ পাঠানোর সকল ব্যবস্থাই পাকাপোক্ত করে ফেলে। এরপর কাজ শুধু এ দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য দিন গোনা।

---

www.pathagar.com

৩

মহাকাশে প্রথম মানুষ

অবশেষে মহাকাশে মানুষের পদচারণার সময় ঘনিয়ে আসে। রাশানরা এ দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য ক্রমে ক্রমে প্রস্তুত হতে থাকেন। তারা Aral সাগরের তীরে Baikonur-এ একটি বৃহৎ Space/Center তৈরী করেন। এছাড়া উপগ্রহ হতে পাঠানো সংকেত গ্রহণের জন্য তাঁরা প্রায় ৪০-টির মত রেডিও সেন্টারও তৈরী করেন।

তাঁরা ১২ জন নভোচারীকে ট্রেনিং দিয়ে শেষে সবচেয়ে ভাল যাকে মনে করেন তাকে মহাকাশে পাঠানোর জন্য ঠিক করেন। নভোচারীদের জন্য এ ট্রেনিং-এর সময়গুলো ছিল খুবই বাজে সময়। তাদের বিমানে করে নিয়ে গিয়ে সাগর, বন ও আরো সব মারাত্মক স্থানে ফেলে দেয়া হত। তাদের ইলেকট্রিক শক দেয়া হত এবং শক্তিশালী ইলেকট্রিক বাল্বের নিচে রাখা হত। তাদের গোসলের জন্য বরফের মত ঠাণ্ডা পানি দেয়া হত। তাদেরকে বাক্সবন্দী করে বাক্সটিকে খুব জোরে ঘোরানো হত। তাদেরকে একটি চেয়ারে বসিয়ে চেয়ারটিকে জোড়ে কাঁপানো হত। এসব ব্যায়ামই তাদেরকে সুপার ম্যান হতে সহায়তা করে।

নভোচারিগণকে যাত্রার জন্য একটি Simulator-এ নিয়ে ট্রেনিং দেয়া হয়। এ সিমিউলেটরটিকে ভোস্টক নভোযানের অনুরূপ করে তৈরী করা হয়। মহাশূন্যে একটি নভোযান যেভাবে চলাচল করে এটা ঠিক সেরকম ব্যবহার করে। এটা মানুষকে মহাশূন্যের অবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষা দেয় যেমন এর মধ্যে পিন পতন নিস্তব্ধতা এবং একা থাকার অভিজ্ঞতা নভোচারীরা অর্জন করেন। এছাড়া মহাশূন্যের ওজনহীনতা সম্পর্কে মানুষ এ সিমিউলেটার হতে বেশ ভাল অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন যদিও হুবহু 'ওজনহীনতা' উপলব্ধি মানুষ সিমিউলেটার হতে পান না।

মানুষের শরীরের ওপর অভিকর্ষ শক্তির কোন প্রভাব না থাকলে মানুষ 'ওজনহীনতা' অনুভব করে। তোমরা নিজেরাই এখন চিন্তা কর তোমাদের শরীরের কোন ওজন না থাকলে কেমন হত? পৃথিবীতে মানুষ ওজন অনুভব করে, কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি মানুষের দেহে কাজ করে। পৃথিবীর আকর্ষণ

www.pathagar.com

শক্তি এর পৃষ্ঠে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং পৃষ্ঠ থেকে যতই উপরে ওঠা যায় ততই এ আকর্ষণ শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। তাই একজন নভোচারী পৃথিবীর পৃষ্ঠ ছেড়ে যতই বাইরে যেতে থাকবে ততই পৃথিবীর টান তার ওপর থেকে উঠে যেতে থাকবে। এ কারণে তার ওজন আস্তে আস্তে কমতে থাকে। মহাকাশে মানুষের ওজন একেবারে প্রায় থাকেই না। তাই সে অতি সহজেই নভোযানে অথবা নভোযানের বাইরে মহাশূন্যে হাঁটতে পারে, এতে তার পড়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

'ওজনহীনতা' মানুষের দেহে একটি অদ্ভুত অনুভূতির জন্ম দেয়। তখন নিজের দেহকে আর নিজের বলে মনে হয় না। হাত পা ঠিকমত কাজ করতে চায় না। আর সাধারণ ভাবে হাঁটাও যায় না—বাতাসে ভেসে সাঁতরাতে হয়। 'ওজনহীনতা' নানারকম বস্তুর ওপরও ক্রিয়া করে। তাই নভোযানের নানা রকম জিনিস যাতে ভেসে না থাকে সেজন্য ওগুলোকে নভোযানের দেয়াল ও মেঝের সাথে আটকে রাখা হয়। মজার ব্যাপার হল যে এ অবস্থায় কোন পানীয়কে কাপ থেকে ঢালা যায় না। কারণ তরলটি তো আর ভেসে মুখে চলে আসবে না। তাই কাপ থেকে ঢেলে কোন তরল পান করা যায় না। সেখানে টিউব থেকে চুষে চুষে তরল পান করতে হয়।

একটি সিমিউলেটরে গোলাকার ছোট ছোট জানালা থাকে। এছাড়া বিছানা, চেয়ার, টেবিল এসবও থাকে। একজন নভোচারী এ সিমিউলেটরের ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। এরপর তাকে মহাশূন্যের নানারূপ অবস্থায় ফেলা হয়, একটি মেশিনের সাহায্যে যেটা একজন বিজ্ঞানী কন্ট্রোল করেন। তিনি সিমিউলেটরের ভেতরের মানুষটিকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং একটার পর একটা কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন। এ অবস্থায় ভেতরের মানুষটি হয়তো হঠাৎ দেখতে পায় যে কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে। তখন তাকে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করতে হয়।

সিমিউলেটরের ভেতরের মানুষকে ডাক্তাররা সবসময় পর্যবেক্ষণ করেন। ট্রেনিং-এর সময় যে সব কাজ করা হয় সে সব কাজ লোকটির দেহে ও মনে কি কি ক্ষতি করছে তা তাঁরা লক্ষ্য করেন। বিশেষ ধরনের জিনিষপত্র দিয়ে তাঁরা লোকটির হার্টবিট ও ব্লাডপ্রেসার ঠিক আছে কিনা দেখেন। লোকটির

www.pathagar.com

শরীরে যদি কোন খারাপ লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন তারা তার প্রতি বিশেষ নজর দেন এবং প্রয়োজন বিশেষে তার ট্রেনিং স্থগিত রাখেন।

নভোচারীদের সিমিউলেটরের ভেতরে বেশ কিছুদিন কাটাতে হয়। প্রথমে নীরবে একা থাকতে তাদের বেশ খারাপ লাগে। প্রচণ্ড নীস্তব্ধতায় তাদের মনের ভেতর ভয় ঢুকিয়ে দেয়। তারা সিমিউলেটারের দরজা ভেঙ্গে পালাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তারা এ অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন।

যখন সমস্ত ট্রেনিং শেষ হয়ে এল তখন রাশান বিজ্ঞানী ও ডাক্তারগণ ইউরী গ্যাগারিন নামক একজন লোককে মহাশূন্যে পাঠানোর জন্য পছন্দ করেন। তারা অবশ্য Gherman Titov নামে দ্বিতীয় একজনকেও ঠিক করে রেখেছিলেন। যদি গ্যাগারিন কোন কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন তার পরিবর্তে টিটোভকেই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে হত। তারা উভয়েই রাশান বিমান বাহিনীর সদস্য ছিলেন।

গ্যাগারিনের বয়স তখন ছিল মাত্র ২৭ বছর। তিনি সবসময় হাসি খুশি থাকতেন। তার মহাকাশ যাত্রার কথা শুনে তিনি খুশীতে আত্মহারা হয়ে পড়েন।

রাশানরা ১৯৬১ সনের ১২ই এপ্রিল তারিখে মহাশূন্যে গ্যাগারিনের যাত্রা করার জন্য ঠিক করেন।

ঐদিন যাত্রার আগে স্পেস সেন্টার খুবই কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ে। কন্ট্রোল-রুমে ইঞ্জিনিয়াররা সমস্ত প্লান ঠিক করে কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ঠিক করেন। এছাড়া কেউ কেউ আবার রকেট ও মহাকাশযান ঠিক আছে কিনা দেখে উড্ডয়নের পথ পরিষ্কার করেন। এসময় হাজার হাজার সৈন্য ঐ স্পেস সেন্টারকে পাহারা দেয়।

গ্যাগারিন ও টিটোভ ট্রেনিং-এর পর বেশ কিছুদিন আমোদ ফূর্তিতে কাটান। অবশেষে যাত্রার দিন ঘনিয়ে আসে এবং তারাও যাত্রার আগের রাতে ভালভাবে ঘুমিয়ে প্রস্তুত হয়ে নেন।

১২ই এপ্রিল সকাল সাড়ে পাঁচটায় একজন ডাক্তার গ্যাগারিনকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তার শরীর ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করেন। অবশেষে তিনি রায় দেন যে গ্যাগারিন বেশ ভাল অবস্থাতেই আছেন। তারপর দুজনে মাংস, ফলমূল এবং কফি দিয়ে সকালের নাস্তা সেরে নেয়ার পর গ্যাগারিন তার স্পেস স্যুট পরে নেন। এ স্যুটটি মানুষকে সূর্যের বিকিরণকৃত মারাত্মক কণিকাসমূহ হতে রক্ষা করে। তারপর তাকে বাসে করে 'বৈকোনার স্পেস সেন্টারে' নিয়ে যাওয়া হয়।

www.pathagar.com

ইউরি গ্যাগারিন—মহাকাশের প্রথম মানুষ।

সেখানে ভোস্টক নামের মহাকাশযান ও রকেট উড্ডয়নের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। রকেটটির উচ্চতা ছিল প্রায় উনচল্লিশ মিটার এবং জ্বালানিশুদ্ধ এর ওজন ছিল পাঁচশত টনের কাছাকাছি।

গ্যাগারিন লিফটের সাহায্যে মহাকাশযানে উঠে কিছু যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে উড্ডয়নের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এরপর কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে গ্যাগারিনকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয় এবং সময় গোনা শুরু হয়। অবশেষে ভীষণ গর্জন করে রকেটটি পৃথিবীর মাটি ছেড়ে মহাকাশের দিকে পাড়ি জমায়।

একটি রকেট হঠাৎ যে গতিবেগ অর্জন করে তাতে মহাকাশযানের ভেতরে ভীষণ চাপের সৃষ্টি হয়। ফলে যানের অভ্যন্তরীণস্থ সকল কিছুই ভীষণ চাপ অনুভব করে। ভোস্টকটির উড্ডয়নের সময় যানের ভেতরের প্রান্তে চাপের ফলে গ্যাগারিন একটুও নড়াচড়া করতে পারছিলেন না। তার মনে হচ্ছিল যে, তার হাঁটু বোধ হয় গুড়িয়ে যাবে, আর সারা শরীর হয়তো বা ফেটে যাবে। তারপর আস্তে আস্তে যখন চাপ কমতে লাগল তখন তার শরীরের ব্যথে অনুভূতিটাও চলে গেল।

www.pathagar.com

রকেটটি মহাকাশযানটিকে ভূপৃষ্ঠ হতে প্রায় ৩২০ কিলোমিটার উপরে নিয়ে যাওয়ার পর যানটি রকেটটিকে ছেড়ে দিয়ে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে শুরু করে।

গ্যাগারিন তখন মহাকাশে সম্পূর্ণ একা ছিলেন, ভাবতেই তো মন শিউরে ওঠে। তিনি জানালা দিয়ে নিচে পৃথিবী দেখতে পেলেন। তিনিই প্রথম দেখলেন পৃথিবীটা দেখতে চাঁদের মতই গোলাকার। এর আগে কোন মানুষ দেখতে পায়নি যে পৃথিবীটা গোলাকার। তখন পৃথিবীর একটা অংশ সূর্যালোকে উদ্ভাসিত ছিল কিন্তু অন্য অংশ ছিল অন্ধকার ঠিক রাত্রিতে চাঁদটিকে যেমন দেখা যায়। কোন মানুষই তার আগে পৃথিবীর এ উজ্জ্বলরূপ দেখতে পায়নি। গ্যাগারিন পৃথিবীর এ সুন্দর রূপ দেখে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে বলে উঠেছিলেন "Oh ! It's A Wonderful Picture ! Wonderful !"

এ সময় ভোস্টক নভোযানটি ঘণ্টায় ২৯০০০ কিলোমিটার বেগে বিচরণ করছিল।

এ সময় গ্যাগারিন ওজনহীনতা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি তার নভোযানের জানালায় এক ফোটা পানি দেখে হাত বাড়িয়ে তা ধরতে গিয়ে তার বসার জায়গা থেকে ভেসে অন্যত্র চলে যান।

এ যাত্রার সময় রাশিয়া চল্লিশটিরও বেশি রেডিও স্টেশন যানটির অবস্থান নির্দেশ করে। আর ইঞ্জিনিয়ারগণ কম্পিউটার ও টিভি পর্দার ছবি দেখে রেডিওর মাধ্যমে গ্যাগারিনের সাথে কথোপকথন চালান।

এ যাত্রার সময় কোনরূপ গোলযোগ দেখা দেয়নি। ফলে যাত্রাটি খুব সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়।

ভোস্টকটি মাত্র একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। তারপর একটি ছোট রকেট চালু করে এর গতিবেগ কমিয়ে আনা হয়। ফলে যানটি আরোও নিচের কক্ষপথে পড়তে পড়তে অবশেষে পৃথিবীর পথে যাত্রা করে।

পৃথিবীতে ফিরে আসাটা এক মারাত্মক ব্যাপার। কারণ এতে আবার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতর প্রবেশ করতে হয়। মহাকাশযানটি যখন মহাকাশে বিচরণ করে তখন এটার গতিবেগ অতি প্রচণ্ড থাকে। এ গতিবেগে যদি এটা

www.pathagar.com

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তবে ঘর্ষণের ফলে যে তাপ উৎপন্ন হবে তাতে যানটি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া আরেকটি বিপদও আছে। সেটা হল যানটি অবশ্যই ভুল কোন কোণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যদি এতে কোন ভুল হয় তবে যানটি বায়ুমণ্ডলের সাথে বারি খেয়ে আবার মহাকাশে চলে যেতে পারে। এসব মারাত্মক বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যানটির গতিবেগ কমিয়ে অবশ্যই এটাকে কোন নির্ভুল কোণে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করাতে হয়।

একটি আগুনের গোলার মত ভোস্টকটি পৃথিবীতে ফিরে আসতে থাকে। এটার বাইরের আবরণটি এ ব্যবস্থার ঘর্ষণের ফলে আগুনের ফুলকির মত নীল রং ধারণ করে। গ্যাগারিন অবস্থাটি জানালা দিয়ে দেখেছিলেন আর ভাবছিলেন বাইরে এগুলো আবার কি হচ্ছে!

এরপর আরেকটি রকেট চালু করে এর গতিবেগ কমানো হয় এবং এটা ভালভাবেই বায়ুমণ্ডলের ভেতর পূর্ণ প্রবেশ করে।

একটার পর একটা প্যারাস্যুট খুলে এর গতিবেগ আস্তে আস্তে অনেক কমিয়ে আনা হয়। অবশেষে এর গতিবেগ যখন মাত্র ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার তখন এটি একটি মাঠের মধ্যে অবতরণ করে।

মহাকাশে মানুষের প্রথম যাত্রাটি এক ঘণ্টা ৪৮ মিনিট কাল স্থায়ী ছিল। গ্যাগারিন যখন মাঠে ল্যাণ্ড করে তখন মাত্র তিনটি প্রাণী গ্যাগারিনকে দেখে। এরা হল একজন মহিলা, একজন বালিকা ও একটি গরু।

গ্যাগারিন ক্যাপসুলটি থেকে বেরিয়ে তাদের দিকে হেঁটে যায়। তারাও গ্যাগারিনের দিকে আসতে থাকে। কিন্তু তাদের নজর যখন গ্যাগারিনের পরিহিত স্পেসস্যুটের দিকে যায় তখন তারা হাঁটা থামিয়ে হা করে গ্যাগারিনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তখন তারা ভাবতে থাকে একি কোন অন্য গ্রহের মানুষ।

মহিলাটি খুব ভয়ের সাথে গ্যাগারিনকে তখন জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি মহাকাশ থেকে এসেছ'? গ্যাগারিন তখন হেসে উত্তর দেয়, 'হ্যা, আমি মহাকাশ থেকেই এসেছি। তুমি কি বিশ্বাস কর, আমি যে মহাকাশ থেকে এসেছি?'

www.pathagar.com

রাশানরা এতে বেশ মুগ্ধ হয়ে পড়ে। তারা উত্তেজিতও হয়ে পড়ে। সব জায়গাতেই তখন একই কথা গ্যাগারিন মহাকাশ থেকে ঘুরে এসেছে। রাশিয়ার লোকজন গ্যাগারিনকে তার এ কাজের জন্য অনেক কিছুদিয়ে সম্মানিত করে।

এ মারাত্মক অভিযান সারা পৃথিবীতে মহাআলোড়নের সৃষ্টি করে। সব দেশেই তখন রাশিয়া ও গ্যাগারিনের সুনাম করতে থাকে।

এ ছিল গ্যাগারিনের মহাকাশ যাত্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এর প্রায় সাত বছর পর ১৯৬৮ সনে গ্যাগারিন এক প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যান।

---

www.pathagar.com

৪
চাঁদে যাওয়ার উপায়

রাশিয়ার এ সাফল্যের পর আমেরিকার বিজ্ঞানীদের মাঝে হতাশা এসে ভিড় করে। কিন্তু তবুও তারা মহাকাশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ছিলেন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। আর এ সংকল্পই মহাকাশের পথে তাদের অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যায়।

গ্যাগারিনের উড্ডয়নের কয়েক সপ্তাহ পর আমেরিকা অ্যালান শেফার্ড নামে একজন লোককে মহাশূন্যে পাঠায়। শেফার্ডের মহাকাশ যাত্রা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। তার যানটি শুধু বায়ুমণ্ডলের উপরে উঠে এবং সাথে সাথে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। এটা কোন কক্ষপথে যায়নি। এ যানটির যাত্রাকাল ছিল মাত্র পনেরো মিনিট। সুতরাং গ্যাগারিনের যাত্রার সাথে এর কোন তুলনা চলে না। কিন্তু এর ফলে বিজ্ঞানীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

আমেরিকা এরপর চাঁদে মানুষ পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন, '১৯৭০ সনের পূর্বে আমরা একজন মানুষকে চাঁদে অবতরণ করাব এবং সুস্থাবস্থায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনব'।

এখানে জানা দরকার The National Aeronautics and Space Administration/(NASA) আমেরিকার সকল মহাকাশ যাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং চাঁদে মানুষ পাঠানোর জন্য তাদের খুব বড় ধরনের খাটুনি খাটতে হয়।

চাঁদে মানুষ অনেকভাবেই পাঠানো যেতে পারে। যেমন একটি নভোযানকে চাঁদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সরাসরি চাঁদে অবতরণ করানো যেতে পারে। কিন্তু এতে শুধু একটা দিক দেখা হয় কারণ নভোযানটিকে আবার পৃথিবীতে ফেরত আনতে হবে। অবতরণের পর আবার হয়তো যানটিকে রকেটের সাহায্যে পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে দেয়া যায়। কিন্তু এর জন্য প্রচুর সরঞ্জামের দরকার হবে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল, এত সকল জিনিষ পত্রকে কি চাঁদে পাঠানো সম্ভব হবে কিনা? আর পাঠানো গেলেও নভোচারীরা এগুলো ঠিকভাবে বসিয়ে তৈরী করতে পারবেন কিনা? এসব সমস্যা বিজ্ঞানীদের কাছে

www.pathagar.com

অসুবিধাজনক মনে হওয়ার ফলে তারা সরাসরি অবতরণের চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেন।

এরপর বিজ্ঞানীরা আরো অনেক রকম চিন্তা ভাবনার পরীক্ষা করে সঠিক প্ল্যান তৈরী করার চেষ্টা করেন। অবশেষে অনেক মাস পরিশ্রম করে তারা তাদের মনের মত একটি প্ল্যান তৈরী করেন। এটা হল 'অ্যাপোলো প্ল্যান'।

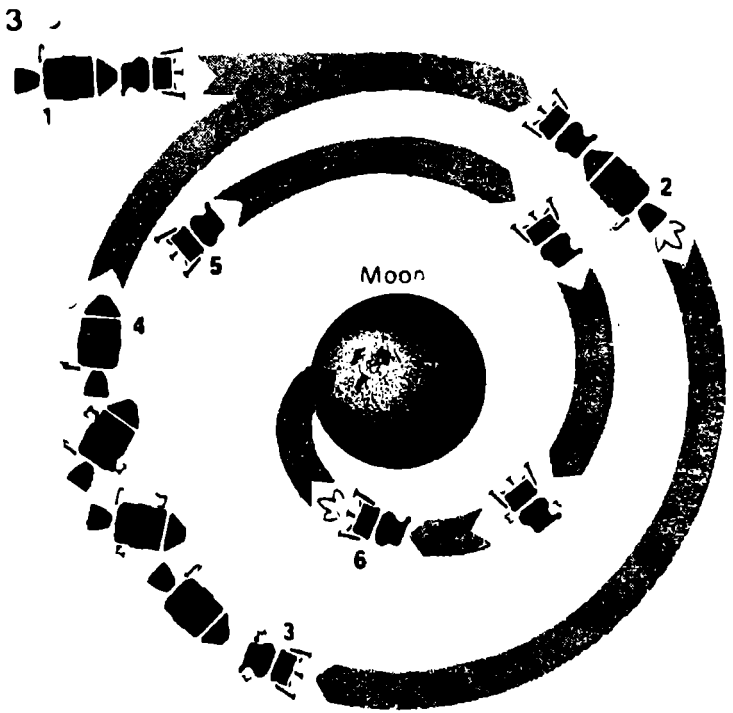

1. অ্যাপোলো চাঁদের কাছে পৌঁছুলো।
2. ক্রুরা অ্যাপোলোর দিক পরিবর্তন করে একটি ইঞ্জিন চালু করলেন এর বেগ কমানোর জন্য।
3. লুনার মডিউলটিকে ছুটিয়ে ফেললেন।
4. কমাণ্ড মডিউলটিকে পার্কিং অরবিটে নিয়ে যাওয়া হল।
5. কমাণ্ড মডিউলটিকে আরেকটু নিচুতর অরবিটে নামানো হল।
6. আস্তে আস্তে চাঁদের দিকে নামতে থাকল।

www.pathagar.com

কার্যকরী করার জন্য এই প্ল্যানটি খুবই জটিল, কিন্তু সাধারণভাবে এটাকে অনেক সহজ মনে হয়। তিনজন নভোচারী এ যানে যাত্রা করতে পারে। এ যানটি প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত থাকে। এ তিনটি ভাগ হল 'কমাণ্ড মডিউল', 'সার্ভিস মডিউল' এবং 'লুনার মডিউল'। নভোচারিগণ থাকেন কমাণ্ড মডিউলে। সার্ভিস মডিউলে জ্বালানি ও রকেট ইঞ্জিন থাকে যেটা প্রোবকে শক্তি দান করে। আর লুনার মডিউলটিকে ব্যবহার করা হয় চাঁদে অবতরণের জন্য। এ লুনার মডিউলে আবার নিজস্ব রকেট থাকে যার সাহায্যে এটা আবার চাঁদ থেকে উড্ডয়ন করতে পারে। ফলে চাঁদ থেকে উড্ডয়নের জন্য কোন আলাদা সরঞ্জামাদির দরকার হয় না।

এবার দেখা যাক কিভাবে চাঁদের যানটি চাঁদে অবতরণ করে। যখন অ্যাপোলো যানটি চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে যায় তখন এটা চাঁদকে কেন্দ্র করে একটি কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। এ কক্ষপথটিকে বলে 'পার্কিং অরবিট' এসময় একজন লোক প্রোবে থেকে যায় এবং চাঁদের চারদিকের কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে থাকে। অন্য দুজন তখন যানটির লুনার মডিউলে চলে যায়। অতঃপর লুনার মডিউলটিকে প্রধান যান হতে বিচ্ছিন্ন করিয়ে এটাকে আস্তে আস্তে চাঁদে অবতরণ করানো হয়। যখন তাদের চাঁদ ত্যাগ করার সময় হয় তখন তারা আবার আরেকটি রকেট চালু করে এবং লুনার মডিউলটি এর নিজের শক্তি দ্বারা পুনরায় গিয়ে প্রধান যানটির সাথে মিলিত হয়। শুনতে সোজা মনে হলেও এ সংযোগের জন্য প্রচণ্ড উৎকণ্ঠিত থাকতে হয়। কারণ সংযোগটা সম্পূর্ণ সময়ের উপর নির্ভরশীল। সময়ের হেরফের হলে দুটোরই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দুটির এ সংযোজিত হওয়ার ঘটনাকে 'ডকিং' বলে। সংযোগের পর যে দুজন মানুষ লুনার মডিউলে থাকে তারা আবার কমাণ্ড মডিউলে প্রথম জনের সাথে মিলিত হতে পারেন।

এখানে পার্কিং অরবিট এবং চাঁদের অবতরণের ঘটনাটি সম্ভব কারণ চাঁদের মহাকার্ষ শক্তি আছে। চাঁদের আকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির ছয় ভাগের একভাগ, কিন্তু তবুও চাঁদে অবতরণ করা ও চাঁদের পৃষ্ঠে হাঁটা সম্ভব।

চাঁদ থেকে ফিরে আসার পর নভোচারীদের লুনার মডিউলটির আর কোন প্রয়োজন হয় না। ফলে তারা এটাকে ছাড়াই আবার পৃথিবীতে পাড়ি জমান। যখন তারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আসেন তখন তারা সার্ভিস মডিউলের একটি রকেট চালু করে তাদের গতিবেগ কমিয়ে নেন। অতঃপর তারা এ মডিউলটিকেও

www.pathagar.com

ছেড়ে দেন এবং শুধু কমাণ্ড মডিউলের সাহায্যে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। এ প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করার জন্যই NASA অভিমত প্রকাশ করে।

নাসা (NASA) এ বৃহৎ যাত্রার জন্য সবকিছু ঠিক করতে থাকে। এর আগে কোন দেশই এরকম বৃহৎ একটি কাজ হাতে নেয়নি। এখন তোমরাই চিন্তা কর কত কাজ তাদের করতে হয়েছিল।

বিজ্ঞানীদের রেলওয়ে ইঞ্জিনের মত বড় 'অ্যাপোলো' মহাকাশ যানকে নক্‌শা করে তৈরী করতে হয়েছিল। এছাড়া এটাকে উড্ডয়নের জন্য ফুটবলের মাঠের মত দীর্ঘ রকেটও বিজ্ঞানীদের বানাতে হয়েছিল।

যেহেতু বিজ্ঞানীরা মহাকাশে কোন পরীক্ষা চালাননি সেহেতু মহাকাশ যানটির নক্‌শা করতে তাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। যখন তারা একটি প্রোবের নক্‌শা করলেন তখন নিজেদেরই নিজেদের জিজ্ঞেস করতে হয়েছিল। মহাকাশে এটা কিরূপ কাজ করবে? বিজ্ঞানীরা অতঃপর প্রোবগুলোর নানারকম মডেল তৈরী করে সিমিউলেটরের পরীক্ষা করে যে সকল ভুল ত্রুটি ধরতে পারেন সেগুলো আস্তে আস্তে সংশোধন করতে থাকেন। এ সিমিউলেটরটি মহাকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করার ফলে বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনেকদূর এগিয়ে যায়।

এসকল পরীক্ষার যন্ত্রগুলোর মধ্যে অনেকগুলি মজার জিনিষ থাকে। এগুলোর মধ্যে একটি হল 'গ্যাস গান' একটি মডিউল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পূর্ণ প্রবেশ করার সময় কি রকম ব্যবহার করবে তা এ গ্যাসগানের পরীক্ষাটি থেকে জানা যায়।

এ পরীক্ষাটিতে একটি মডেলকে প্রায় ৩২০০০ কি.মি. ঘণ্টা বেগে একটি টিউবের ভেতর দিয়ে ছোঁড়া হয়। একই সময়ে টিউবের অপর দিক হতে প্রচণ্ড গরম গ্যাসকে টিউবের ভেতর ঢোকানো হয়। ফলে মডেলের বিরুদ্ধে গ্যাসের চাপটি থাকে প্রচণ্ড তীব্র। একটি মহাকাশযান পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে এর কি কি ক্ষতি হয় তা এ পরীক্ষাটি থেকে বোঝা যায়।

বিজ্ঞানীরা যে পর্যন্ত তাদের বানানো মডেল মহাকাশযান গুলোকে পরীক্ষা করার পর খুশী না হতে পারেন ততক্ষণ পর্যন্ত তারা একটার পর একটা মহাকাশ-যানের নক্‌শা তৈরী করেই চললেন। অবশ্য এরপর অবশ্যই তাদের সত্যি মহাকাশ যান তৈরী করতে হবে। আবার এটা বানানোর জন্যও প্রয়োজন নানা-রকম অভিজ্ঞতার। একটি প্রোবে নানাধরনের হাজার হাজার যন্ত্রাংশ থাকে।

www.pathagar.com

শতশত ফ্যাক্টরী এ যন্ত্রাংশগুলো তৈরী করে। তারপর ভাল ভাল ইঞ্জিনিয়ারগণ এসব যন্ত্রাংশগুলো একত্রিত করে 'মহাকাশযান' তৈরী করেন।

একটি রকেট তৈরী করাও একই রকম কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এপোলো প্ল্যানের জন্য তখন যেরকম রকেট ছিল সেগুলোর থেকে পাঁচগুণ শক্তিশালী রকেট তৈরী করতে হয়েছিল। বিজ্ঞানী ওয়ারনার ভন ব্রাউনকে দেয়া হয়েছিল রকেট তৈরী করার বিশাল দায়িত্ব। এছাড়া তিনি একাজটি পেয়ে খুশীই হয়েছিলেন। কারণ তিনি সবসময় চাঁদে মানুষ পাঠানোর জন্য রকেট তৈরী করতে চাইতেন।

ভন ব্রাউন এবং তার সহকারীদেরও রকেট তৈরীর ক্ষেত্রে অনেক রকম পরীক্ষা চালাতে হয়েছিল। যখন তারা একটি রকেট ডিজাইন করতেন তখন তারা সে মডেলটিকে একটি স্ট্যাণ্ডের সাহায্যে দাঁড় করাতেন। তারপর রকেটটিকে নানারকম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেয়া হত। উড্ডয়নের সময় একটি রকেটের উপর কি রকম চাপ পড়বে তা এপরীক্ষাটি দ্বারা বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারতেন। যদি বিজ্ঞানীরা পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করতে পারতেন তাহলে তারা ঐ রকেট মডেলটিকে বাতাসে আবার পরীক্ষা করতেন।

বিজ্ঞানীদের এ সকল রকেটকে পরীক্ষা করার জন্য দেশের নির্জন জায়গায় রকেট স্টেশন তৈরী করতে হয়েছিল। এ কাজের জন্য তারা মিসিসিপি নদীর তীরে এক নির্জন জায়গায় একটি স্টেশন তৈরী করেন। সেখানে রকেটের গর্জন লোকালয় থেকে শোনা যায় না। আর জানমালের কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না।

সেখানে আরো অনেক কাজই বিজ্ঞানীদের করতে হয়েছিল। যেমন নদীর পাশের বন্যার্ত এলাকা হতে ড্রেন কেটে পানি দূরে সরিয়ে সেখানে স্পেস সেন্টার মুনপোর্টকে তৈরী করতে হয়েছিল। সেখানে ওয়ার্কশপ, ল্যাবরোটারী ও অফিসও ছিল। অতঃপর তারা কেপ কেনেডিতে তাদের মহাকাশযান উড্ডয়নের স্থান তৈরী করেন, হিউস্টোনে তাদের একটি বড় ধরনের কন্ট্রোল সেন্টার এবং সারা পৃথিবী জুড়ে ট্র্যাকিং স্টেশন তৈরী করতে হয়েছিল। এছাড়া তারা নভোচারীদের জন্য একটি ট্রেনিং সেন্টারও গঠন করেছিলেন।

www.pathagar.com

মহাকাশযান রকেট, কন্টোলসেন্টার ও ট্র্যাকিং স্টেশনের জন্য বিজ্ঞানীদের অনেক নতুন নতুন যন্ত্রাংশ তৈরী করতে হয়েছিল। এক্ষেত্রে কিছু কিছু জিনিস বানাতে তাদের বেশ বেগ পেতে হয়। এসব জিনিসপত্র প্রকৃতির কোন খনিজ থেকে বানানো যায়নি। ফলে তাদের সাথে কেমিস্টদেরও কাজ করতে হয়। কেমিস্টরা নানারকম সংমিশ্রণের মাধ্যমে এসব জিনিস তৈরী করতে বিজ্ঞানীদের সহায়তা করেন।

নাসা এ কাজের জন্য প্রায় ৪,০০,০০০ লোককে কাজে লাগায়। এ সকল পুরুষ ও নারীকে ২০,০০০ Industrial Organization ও ১৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জোগাড় করা হয়েছিল।

এ কাজে নাসার ২০,০০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি খরচ হয়। তবে আমেরিকা চাঁদে মানুষ পাঠানোর জন্য এর থেকেও অনেক বেশি অংকের টাকা খরচ করতে প্রস্তুত ছিল।

---

www.pathagar.com

৫

নভোচারীদের অনুশীলন

নভোযান রকেট প্রভৃতির নক্‌শা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও চাঁদে মানুষ পাঠানোর জন্য বিজ্ঞানীদের আরও অনেক কিছু জানার বাকি ছিল। মহাকাশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের দেহে ও মনে কি রকম প্রভাব ফেলে তা তখনও পুরোপুরি জানা হয়নি। এ অবস্থায় বিজ্ঞানীদের মনে অনেক প্রশ্নের উদয় হয়। যেমন মানুষ কতক্ষণ মহাকাশে বেঁচে থাকতে পারবে? চাঁদের পথে যাত্রার পর নভোচারিগণ কি বেঁচে থাকতে পারবেন? চাঁদের পথে যাত্রার পর তারা কি তাদের নভোযান ছেড়ে বাইরে গিয়ে আবার পৃথিবীতে নিরাপদে ফিরে আসতে পারবেন? তারা কি ওজনহীন অবস্থায় চলাচল করতে সক্ষম হবেন? এছাড়া আরো একটি প্রশ্ন ছিল তাদের মনে, সেটা হল এ্যাপোলোর এ জটিল কার্যাদি কি নভোচারীরা সঠিকভাবে করতে পারবেন?

কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর শুধু একটিই। সেটা হল মানুষকে পরীক্ষাযান নিয়ে মহাশূন্যে গিয়ে সমস্ত পরীক্ষা করতে হবে।

এছাড়াও বিজ্ঞানীদের চাঁদের পৃষ্ঠ সম্পর্কেও জানা প্রয়োজন ছিল। চাঁদের পৃষ্ঠটি কতটুকু শক্তিশালী? এটা কি শক্ত না নরম? লুনার মডেলটির ভর আগলে রাখার মত শক্ত কি হবে এ পৃষ্ঠটি? —এসব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য বিজ্ঞানীদের অনেক মানুষবিহীন নভোযান চাঁদে পাঠাতে হয়েছিল।

নাসার আরেকটি প্রধান কাজ ছিল নভোচারীদের পছন্দ করে ট্রেনিং দেয়া। ইতিমধ্যেই তারা কিছুলোককে ট্রেনিং দিয়েছিলেন তাদের প্রথম মহাকাশযানের কিন্তু চাঁদে যাওয়ার জন্য তারা প্রায় ৫০ জন নভোচারিকে ট্রেনিং দেন। তারা ২০ থেকে ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে পুরুষদের বাছাই করেন। এদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন বড় ধরনের পাইলট। আর বাকিরা ছিলেন নামকরা ডিগ্রী প্রাপ্ত বিজ্ঞানী। নাসা এ সকল লোকদের টেলিফোন করে তাদের লিস্টে থাকার কথা

www.pathagar.com

জানায়। তারা এ যাত্রার ক্ষতি থেকে আরম্ভ করে সবকিছু নভোচারিদের খোলসা করে বলে তাদের নতামত যাচাইয়ের জন্য সময় দেন।

অবশ্য নভোচারিগণ সবাই এ প্রস্তাবে রাজি হন। এর মধ্যে অনেক লোক বিবাহিতও ছিলেন এবং তাদের ছেলেমেয়েও ছিল। এ অবস্থায়ও তাদের পরিবার থেকে আগ্রহ ব্যতীত অন্য কোনরকম নাবোধক বাক্য শোনা যায়নি বলে তারাও আগ্রহী হয়ে নাসায় নভোচারী বাছাইয়ের এ ট্রেনিং-এ যোগদান করেন। আর তারা যোগদান করবেন না কেন? কোন মানুষ এরকম একটি কাজ হাতছাড়া করবে? তাদের একজন বলেছিলেন, মারাত্মক। অবশ্যই একাজটা মারাত্মক। কিন্তু চিন্তা কেন? রাস্তা পার হওয়ার সময়ওতো আমরা মারা যেতে পারি।

একাজে মানুষের শারীরিক অবস্থা অবশ্যই একটি জরুরি ভূমিকা পালন করে। ট্রেনিং শুরু করার আগে তাই প্রত্যেককে ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখতেন তাদের শরীর ট্রেনিং-এর জন্য ঠিক আছে কিনা। তাদের রক্ত পরীক্ষা থেকে আরম্ভ করে হার্ট, ফুসফুস, পেট, মেরুদণ্ড এবং আরো অনেক প্রয়োজনীয় অংশের এক্সরে করা হত। তাদের চোখ ও কান পরীক্ষা করে তাদের চোখের দৃষ্টি ও কানের শোনার ক্ষমতা পরীক্ষা করা হত। এসব পরীক্ষার পর যাদের অবস্থা ভাল দেখা গেল নাসা তাদেরকেই ট্রেনিং প্রদানের জন্য গ্রহণ করল।

ট্রেনিং-এর সময় নভোচারীদের বিজ্ঞানের অনেক বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়। নক্ষত্র এবং উপগ্রহ সম্বন্ধে প্রচুর লেখা পড়া করতে হয়। তাদের ভূতত্ত্ব বিদ্যাও পড়তে হয়। কারণ তারা চাঁদে হয়তো এমন কোন্ পাথর পেতে পারেন যা চাঁদের বয়সের সাক্ষ্য বহন করবে। ভূতত্ত্ব বিদ্যা শেখার সময় ক্লাসরুম ছেড়ে তাদের মাঠের মধ্যেও যেতে হত। তারা এসময় আমেরিকার নানা জায়গায় ভ্রমণ করতে যান। এছাড়া ভূ-তত্ত্ব বিদ্যার যে শিক্ষক ছিলেন তিনি তাদের এমন সব পাথর নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখাতেন যা হয়তো চাঁদেও পাওয়া যেতে পারে।

ট্রেনিং গ্রহণকারী সকলকে আবার প্রতিদিন বিমানে চড়ে ট্রেনিং নিতে হত। এদের মধ্যে যারা পাইলট ছিলেন তারা দ্রুততর বিমানে উঠে প্রতিদিন আকাশে উড়া অনুশীলন করতেন। আর যারা বিমান চালাতে জানতেন না তাদের বিমান চালানো শেখানো হত। মাঝে মাঝে তাদের হেলিকপ্টারে করে ঘোরানো হত। এ ছোট যানটি অবতরণের সময়ে সোজাসুজি মাটিতে অবতরণ করে।

www.pathagar.com

আর লুনার মডিউলটিও একইভাবে সরাসরি চাঁদের মাটিতে অবতরণ করবে। তাই হেলিকপ্টারে চড়ার ফলে অবতরণের মোটামুটি একটা অভিজ্ঞতা তাদের হত। মহাকাশ সম্বন্ধে তখন যা কিছু জানা ছিল তা নভোচারীদের শেখানো হয়। কিভাবে একটি মহাকাশযান উড্ডয়ন এবং অবতরণ করে এবং কিভাবে একটি রকেট কাজ করে তার সমস্তই তাদের শেখানো হয়। মহাকাশযান ও রকেটগুলো কিভাবে তৈরী তা তাদের সম্পূর্ণভাবে শেখানো হয়। যে সকল বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারগণ

একটি সিমিউলেটরে একজন নভোচারিকে অনুশীলন করতে দেখা যাচ্ছে।

এসবের নক্‌শা করেছিলেন তাদের সাথে তারা দেখা করেন। ফ্যাক্টরীগুলো কিভাবে এসব জিনিস বানাচ্ছে তাও তারা দেখেন। এরকম একটি জটিল যানের প্রতিটি অংশ কিভাবে কাজ করে তারা তা শেখেন। এছাড়া মাটি হতে কিভাবে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাও তারা দেখেন।

তাদের উড্ডয়নের ট্রেনিং দেয়া হত একসারি সিমিউলেটরে। এসবের ভেতর দিয়ে তারা চাঁদের পথে কাল্পনিক যাত্রা করতেন। এসব সিমিউলেটরের মধ্যে প্রথম সিমিউলেটরটি ব্যবহৃত হয় মহাকাশের মধ্য দিয়ে কাল্পনিক যান হিসাবে। এটাতে নানারকম যন্ত্রাদি ও টেলিভিশন থাকে। আর এ টেলিভিশনে গ্রহ ও তারার নানারকম ছবি ভেসে উঠে। চাঁদে যাওয়ার সময় যেসব ছবি নভোচারীরা দেখতে পাবেন সেসব ছবি এসব টিভি পর্দায় ভেসে উঠে। এসব গ্রহ তারার ছবি দেখে ট্রেনিং গ্রহণকারিদের চাঁদে যাওয়ার পথে তারা কোন অবস্থানে আছে তা বের করতে হত।

www.pathagar.com

আরেকটি সিমিউলেটরে তারা চাঁদের পৃষ্ঠে কাল্পনিক অবতরণ করেন। একাজের জন্য দুটি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। প্রথমে একজন পাইলটকে ১৬০ কিলোমিটার উপর থেকে ফেলে দেয়া হয়। এ যন্ত্রের ভেতর একটি টিভি পর্দা থাকে এবং এতে চাঁদের নানারকম ম্যাপ থাকে। অন্যান্য উপগ্রহ থেকে চাঁদের এ ম্যাপগুলো তোলা হয়েছিল।

এসব ম্যাপগুলো টিভি পর্দায় ভেসে ওঠার ফলে পাইলটরা দেখতে থাকেন যে চাঁদটি অনেক এগিয়ে আসছে। চাঁদের পৃষ্ঠের পঞ্চাশ মিটার উপর পর্যন্ত পড়ার পর আরেকটি সিমিউলেটরে তার এ অনুশীলন শেষ হয়। এ যন্ত্রটি দড়ির সাহায্যে ঝোলানো থাকে এবং ভেতরে লোকটির কাছে মনে হয় এটা খুব বেশি গতিবেগে চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ করছে। এবস্থায় পাইলটটিকে রকেট চালু করে গতিবেগ কমিয়ে একটি সামঞ্জস্য বিধান করে কাল্পনিক চাঁদের পৃষ্ঠে যানটিকে অবতরণ করাতে হয়।

এ সিমিউলেটরে ট্রেনিং গ্রহণকারীদের চাঁদের উপরে কিভাবে হাঁটতে হবে তাও শেখানো হয়। তাদের দড়ি দিয়ে একটি ক্রেনের সাহায্যে কাল্পনিক চাঁদের উপর ধরে রাখা হয়। এ অবস্থায় তারা নিজেদের পুরোপুরি ওজনহীন অনুভব করেন। ফলে তারা তাদের পাকে সঠিকভাবে চালাতে পারে না। এভাবে চাঁদে হাঁটাচলা করা যে কি রকম কঠিন ব্যাপার তা তারা উপলব্ধি করেন।

চাঁদ থেকে কিভাবে উড্ডয়ন করতে হয় তা নভোচারীরা আরেকটি সিমিউলেটরে অনুশীলন করেন। যেসব সমস্যা হঠাৎ দেখা দিতে পারে সেসব সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের নানারকম ট্রেনিং দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ পৃথিবীতে ফিরে আসা একটি মারাত্মক ব্যাপার। কারণ নভোযানটি যদি ভুল কোন স্থানে অবতরণ করে তাহলে তো নভোচারীদের ভীষণ বিপদে পড়তে হবে। আমেরিকার কোন নভোযান যাত্রা শেষ হয় আটলান্টিক অথবা প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করে। এগুলো প্যারাসুটের সাহায্যে খুবই কম গতিবেগে সমুদ্রে পতিত হয়। হেলিকপ্টারের সাহায্যে তখন নভোচারিগণকে উদ্ধার করে একটি জাহাজে তোলে নেয়া হয়। এটাই হল আমেরিকার সফল মহাকাশযানের পৃথিবীর বুকে ফিরে আসার সাধারণ নিয়ম। সাধারণত এতে কোন দুর্ঘটনা ঘটে না। কিন্তু দুর্ঘটনাতো ঘটতেও পারে। নভোযানটি হয়তো এমন কোন জায়গাতেও অবতরণ

www.pathagar.com

করতে পারে যেখানে কোন জন-মানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। তখন সাহায্য না আসা পর্যন্ত নভোচারীদের তো বেঁচে থাকতে হবে।

এ বেঁচে থাকার জন্য তাদের কিছু বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তারা মরুভূমি, ঘনবন, সাগরের নানান নীরবতার মাঝে সময় কাটাতেন। প্যারাস্যুট হতে কিভাবে আশ্রয় এবং কাপড় বানাতে হয় তা তারা শিখে নেন। Evaporation-এর সাহায্যে কিভাবে পানি বানাতে হয় তা তাদের শিখিয়ে দেয়া হয়। বন্য পশু মেরে কিভাবে রেঁধে খেতে হয় সেসব ট্রেনিংও তাদের নিতে হয়।

শরীর সুস্থ রাখার জন্য প্রতিদিন একজন নভোচারীকে ব্যায়াম করতে হত। এছাড়া প্রত্যেককেই কিছু না কিছু শারীরিক পরীক্ষা দিতে হয়। এর মধ্যেই অনেকগুলো ছিল বেশ কষ্টকর। যেমন তাকে ছোট টেবিলের উপর উঠে ক্রমাগত লাফাতে হয় এবং একটা থেকে আরেকটায় লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে হয়। তাকে বরফের মত ঠাণ্ডা পানিতে দাঁড় করিয়ে রেখে তারপর শরীরের ব্লাড প্রেসার মাপা হয়। তাকে একটি বিশ্রী কাঠামোর টেবিলে শুইয়ে দেখা হয় তার হার্টের অবস্থা কিরূপ। এ অবস্থায় যিনি খুব কষ্ট ভোগ করেন তাকে একটি চেয়ারে বসানো হয় যা ক্রমাগত কাপতে থাকে, এ সময় চোখ বন্ধ অবস্থায় তাকে বেলেন্স করে কন্ট্রোলারের সাহায্যে চেয়ারটিকে কন্ট্রোল করতে হয়। একটি ছোট রুমে তাকে গরমে প্রায় সিদ্ধ করা হয়। একটি অন্ধকার এবং খুবই নিরিবিলি ঘরে তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে হয়। এরূপ অনেক রকম অসুখকর অনুশীলন একজন মানুষকে নভোচারী হওয়ার জন্য করতে হয়।

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এসব অনুশীলন কি রকম শক্ত। নভোযানে করে যাত্রার আগে প্রত্যেককে প্রায় ১৮ মাস অনুশীলন করানো হয়।

---

www.pathagar.com

৬

যাত্রার জন্য পরীক্ষাযান উড্ডয়ন

চাঁদে যাওয়ার জন্য আমেরিকানরা ১৯৬১ থেকে ১৯৬৯ সনের মধ্যে ২০টি পরীক্ষাযান উড্ডয়ন করেন।

তারা প্রথমে "মার্কারী" নামক ছোট ছোট যানে তাদের পরীক্ষাকার্য চালান। এ যানগুলো মাত্র একজন মানুষ নেয়ার মত শক্তিশালী ছিল।

আমেরিকার নভোচারীদের মধ্যে জনগ্লেন নামে একজন নভোচারী মার্কারীতে করে সর্বপ্রথম পৃথিবীর চারিদিকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে আসেন। তিনি তিনবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন এবং এর জন্য তার সময় লেগেছিল প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। এ যাত্রায় গ্লেন দুটি মারাত্মক দক্ষতা অর্জন করেন। এর প্রথমটি হল তার যাত্রার সময় যানটির অটোমেটিক কন্ট্রোলের ব্যবস্থাটি নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে নিজ হাতে তাকে যানটি পরিচালনা করতে হয়। কন্ট্রোল হাতে না নিতে নিতেই আরেকটি মারাত্মক বিপদ ঘটে। সেটা হল প্রোব থেকে কন্ট্রোল সেন্টারে সংকেত দিতে থাকে যে **HEAT-SHIELD** আল্‌গা হয়ে গেছে। প্রোব যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে তখন এ **SHIELD**-টি যদি পড়ে যায় তবে মহাকাশযানটি বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কন্ট্রোল সেন্টার থেকে এ সমস্যাটি তাড়াতাড়ি গ্লেনকে জানানো হয়। এবস্থায় তাদের স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু গ্লেনের ভাগ্য ভাল বলতে হবে একারণে যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসার পরও এ **SHIELD**-টি ভেঙ্গে পড়ে যায়নি। সত্যি বলতে কি **SHIELD** নিয়ে কোন সমস্যাই ছিল না। বিপদ সংকেতটিই ভুল ছিল। ফলে কোন বিপদ ঘটেনি এবং গ্লেন খুব নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসে।

আরেকটি মার্কারীর পাইলটেরও পৃথিবীতে ফেরার পথে এরকম একটি অসুখকর দক্ষতা হয়েছিল। অবতরণের সময় যানের রকেট কাজ না করার ফলে যেখানে তার নামার কথা সে স্থান থেকে ৩২০ কিলোমিটার দূরে তিনি নামেন। অবশ্য এতে কোন বিপদ হয়নি। কারণ রেসকিউ হেলিকপ্টার গিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করে।

www.pathagar.com

মার্কারীর শেষ যাত্রায় গর্ডন কুপার ২২ বার পৃথিবীতে প্রদক্ষিণ করেন। তিনি মহাকাশে অনেকগুলো পরীক্ষা কার্যও চালান। তিনি এবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েন এবং আবার জেগে উঠেন। কিছু কিছু যন্ত্রপাতি ঘুমানোর পর জেগে উঠার ফলে তার কোন ক্ষতি হল কিনা তা পরীক্ষা করে। এছাড়াও মহাকাশে একজনের চোখ কি রকম কাজ করে তিনি তাও পরীক্ষা করেন। একটি কক্ষপথে তিনি একটি গ্লাসের তৈরি বল ছেড়ে দেন এ গ্লাস বলটি সবসময় আলো বিকিরণ করে। তার পরের বার তিনি আবার এ বলটিকে খোঁজ করেন এবং খুবই পরিষ্কার ভাবেই এটাকে দেখতে পান। এর পর তিনি পৃথিবী থেকে আগত কোন আলো চোখে পড়েকিনা তা দেখার চেষ্টা করেন। এসময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার এক জায়গা হতে প্রচণ্ড শক্তির আলো বিকিরণ করা হয়। তিনি এ আলো কোনভাবে গ্রহণ করেন এবং কোথা থেকে এটি আসছে তা ম্যাপ থেকে নির্ণয় করেন।

মার্কারীর এ যাত্রাগুলি অনেক সমস্যার সমাধান করে দেয়। এটা প্রমাণ করে যে একজন মানুষ অনেক ঘণ্টা মহাকাশে বেঁচে থাকতে পারে। মহাকাশের অবস্থা তার মনের ও দেহের কোন ক্ষতি করে না। অটোমেটিক সিস্টেম নষ্ট হয়ে গেলে নভোচারী নিজেই তার যান কন্ট্রোল করতে পারেন। তিনি নানারকম ছোট খাট পরীক্ষাও মাহাকাশে চালাতে পারেন।

এসময়ে রাশানরাও বসে ছিলেন না। তারাও মহাকাশে অনেক নভোযান পাঠাচ্ছিলেন। প্রথমে রাশানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সময় কাটান ঘারম্যান টিটোভ। তিনি ২৫ ঘণ্টা মহাকাশে কাটান। এসময়ে তিনি পৃথিবীর চারিদিকে ১৬ বার ঘুরে আসেন।

এরপর রাশানরা ২৪ ঘণ্টার পর পর দুটি মহাকাশ যান পাঠায়। এদের মধ্যে একটি ৬০ বার এবং আরেকটি ৪৫ বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। এ মহাকাশ-যান দুটি প্রায় কাছাকাছিই ছিল। এখন প্রশ্নজাগে তারা এমনভাবে দুটিকে ছাড়লেন কেন? তারা কি কোন অবিশ্বাস্য কিছু সাধন করতে চেয়ে ছিলেন?

এর দশমাস পর রাশানরা আবার আরেকটি যান মহাকাশে পাঠান। এবার কিন্তু এ যানটি একজন মহিলা নিয়ে উড্ডয়ন করে। তিনই পিৃথিবীর প্রথম মহিলা যিনি মহাকাশে পারি জমান।

তার নাম হল "ভেলেন্তিনা তেরেস্কোভা"। তার বয়স ছিল ২৫ বছর এবং তখন তিনি একটি সুতার মিলে কাজ করতেন। উড়োজাহাজ থেকে

www.pathagar.com

প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া তার একটি অন্যতম শখ ছিল। তার অবশ্য ইচ্ছা ছিল তিনি পৃথিবীর সর্বপ্রথম মহিলা নভোচারী হয়ে মহাকাশের পথে পারি জমাবেন। ভেলেন্তিনা প্রমাণ করেন যে একজন মহিলাও একজন পুরুষের মত মহাকাশে নির্বিঘ্নে তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন। তিনি পৃথিবীর চারদিকে পঁয়তাল্লিশ বার ঘুরে আসেন এবং এজন্য তার সময় লেগেছিল প্রায় একাত্তর ঘণ্টা।

রাশানরা এরপর পৃথিবীর সর্বপ্রথমবারের মত তিনজন নভোচারীর একটি দলকে মহাকাশে পাঠায়। এরপর দুজনের একটি যানে ALEXEI LEONOV নামে একজন নভোচারী তার যান ছেড়ে মহাকাশে বেরিয়ে পড়েন এবং প্রায় দশমিনিটকাল তিনি সেখানে হাঁটাচলা করেন।

রাশানরা এত সব আজগুবি পরীক্ষা মহাশূন্যে করেছিলেন যে আমেরিকার পক্ষে তা ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু হঠাৎ করে তারা দুবছরের জন্য সবরকম পরীক্ষা ও মহাকাশযান উড্ডয়ন বন্ধ করে দেন।

আর সে সময়েই আমেরিকার বিজ্ঞানীরা তাদের কাজে বৃহৎ অগ্রগতি সাধন করেন। ১৯৬৫ সালের প্রথম দিকে আমেরিকানরা "জেমিনি" মহাকাশযানে করে বৃহৎ ও নানারকম জটিল পরীক্ষা শুরু করেন। এ যানগুলো ছিল মার্কারী যানগুলো থেকে প্রায় দ্বিগুণ বড় এবং এটি দুজন মানুষ বহন করত। এ্যাপোলো প্ল্যানে যে সব কার্যাদি করতে হবে তার অনেকাংশই নভোচারিগণ এ জেমিনি মহাকাশযানে প্রশিক্ষণ করেন।

চাঁদে পৌঁছানোর জন্য অ্যাপোলো মহাকাশযানের কক্ষপথ পরিবর্তন করতে হয়। তাই জেমিনির প্রথম উড্ডয়নে ভার্জিল গ্রিসম এবং জন ইয়াং তাদের কক্ষপথ পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন। তারা পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরেছিলেন। তখন তারা তাদের গতিবেগ বাড়িয়ে তা থেকে আরো উপরে আরেকটি কক্ষপথে চলে যান।

এর পরের বার এডওয়ার্ড হোয়াইট মহাকাশে হাঁটেন। তার শরীর মহাকাশযানের সাথে একটি দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল এবং একটি মজার যন্ত্র তিনি সাথে করে নয়ে যান। যেটা তাকে সঠিক নির্দেশনা দেবে। হোয়াইট প্রায় ২০ মিনিট কাল মহাকাশে ভাসেন। এবস্থায় তিনি নানারকম মজাও করেন। তিনি এবস্থায় এতই মজা পেয়েছিলেন যে, আর মহাকাশযানে ফিরতে চাচ্ছিলেন না।

www.pathagar.com

তার সাথে যিনি মাহাকাশযানে ছিলেন তার নাম ছিল মেরাডিভিট। তিনি শেষ পর্যন্ত হোয়াইটকে ডেকে আনতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ পরীক্ষাটি প্রমাণ করে যে, মানুষ তার যান ছেড়ে মহাকাশে বেরিয়ে আবার সুস্থাবস্থাতেই যানে ফিরে আসতে পারবে। এতে বিজ্ঞানীদের একটি প্রশ্নের সমাধা হল।

এরপরের পরীক্ষাযানটি বিজ্ঞানীদের আরেকটি মূল্যবান প্রশ্নের জবাব দেয়। প্রশ্নটি ছিল, চাঁদে যাওয়া এবং আসতে যতদিন লাগবে মানুষ কি ততদিন বেঁচে থাকতে পারবে? বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন এ যাত্রায় সময় লাগবে এক সপ্তাহের মত। গর্ডন কুপার এবং চার্লস কনরেড আটদিন মহাকাশে কাটিয়ে এসে বিজ্ঞানীদের এ মূল্যবান প্রশ্নের সমাধা করে দেন। এর প্রায় একমাস পর ফ্রাংক বর্মেন এবং জেমস লভেল মহাকাশে প্রায় দুসপ্তাহের মত কাটিয়ে আসেন।

WRLTER/SCHIRRA এবং থমাস স্টেফর্ড নামে দুজন নভোচারী জেমিনিতে করে তাদের উড্ডয়নে বর্মেন এবং লভেলের সাথে মিলতে চেষ্টা করেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি খুব প্রয়োজনীয় পরীক্ষা। SCHIRRA এবং স্টেফর্ড তাদের মহাকাশযান নিয়ে অনেক উঁচুতে উঠতে থাকেন এবং তাদের মহাকাশযানের সাথে বর্মেন এবং লভেলের যানের দূরত্ব থাকে মাত্র একমিটার। এবস্থায় উত্তেজিত নভোচারীরা যেন পাগল হয়ে পড়েন। তারা জানালা দিয়ে একজন অপরজনের দিকে তাকান এবং রেডিওর সাহায্যে বেশ হাসি ঠাট্টা করেন। এরপর SCHIRR এবং স্টেফর্ড তাদের দুজন বন্ধুকে রেখে পৃথিবীতে চলে আসেন আর বর্মেন ও লভেল মহাকাশে তাদের যাত্রা চালিয়ে যান।

এরকম একটি সাফল্যের পর বিজ্ঞানীরা এবার ডকিং এর-পরীক্ষা করেন। একটি যানের সাথে আরেকটি যানের একত্রিত হয়ে লেগে যাওয়ার ঘটনাকেই ডকিং বলে। নেইল আর্মস্ট্রং, ডেভিড স্কট এ ডকিং পরীক্ষায় সর্বপ্রথম যোগদান করেন। তাদের যাত্রার প্রায় একশত মিনিট আগে একটি AGENA রকেট মহাকাশে ছোঁড়া হয়। এদুজন নভোচারী এ রকেটটিকে অনুসরণ করেন এবং পৃথিবীর প্রায় ১৬০ কিলোমিটার উর্ধ্বে তারা মিলত হন। জেমিনি মহাকাশযানটিকে AGENA-এর লেজ বরাবর ছোঁড়া হয়েছিল। অনেক খাটুনির পর তারা জেমিনি মহাকাশযানটিকে AGENA রকেটটির সাথে লাগান। তারা যান দুটিকে একত্রিত করতে পেরেছিলেন ঠিকই কিন্তু তাদের এ পরীক্ষাটি পুরোপুরি সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। মহাকাশযান এবং রকেটটি দুবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার পর

www.pathagar.com

হঠাৎ করে প্রোবটির ইলেকট্রিক সিস্টেমটি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে নভোচারীরা একটি মারাত্মক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। এবস্থায় মহাকাশযান ও রকেটটি এক-সাথে আটকে যায় এবং নানারকম ঘুরপাক খেতে থাকে। আর্মস্ট্রং এবং স্কট সংযোগটি ছোটানোর জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করেন। তাদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে কারণ একেবারে শেষ মুহূর্তে রকেট ও মহাকাশযানের সংযোগ ছুটে যায় এবং তারা তাড়াতাড়ি পৃথিবীর পথে যাত্রা করেন। এ দুর্ঘটনায় তাদের মারা যাওয়ার সম্ভাবনাই ছিল বেশি।

এরপর টম স্টেফর্ড এবং EUGENE CERNAN একই রকমভাবে একটি ডাকিং পরীক্ষা চালান। কিন্তু রকেট গণ্ডগোল থাকার কারণে তাদের আর পরীক্ষা করা হয়নি। তবে কয়েকটি ভাল কাজ করেছিলেন। যেমন তিনি দুঘণ্টারও বেশি সময় মহাকাশে হেটেছিলেন।

এর পরের যাত্রায় জন ইয়াং এবং মাইকেল কলিন্স বেশ ভাল সফলতা অর্জন করেন। তাঁরা দুটি রকেটের সাথে একবারে আলাদাভাবে মিলিত হন। তারা প্রথমে নিচুতর কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান একটি রকেটের সাথে মিলিত হন এবং পরে আরোও অনেক উঁচুতে পৃথিবী থেকে প্রায় ৭৬০ কিলোমিটার উপরে দ্বিতীয় রকেটের সাথে মিলিত হন। নভোচারীরা প্রথম রকেটকে ছেড়ে দিয়ে তারপরে দ্বিতীয় রকেটটির সাথে মিলিত হন। এ কাজ শেষ হতে না হতেই কলিন্স মহাকাশে হাটার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি শান্তভাবে জেমিনি মহাকাশযান ছেড়ে মহাশূন্যে বেরিয়ে পড়েন এবং এজিনা রকেটটিকে পরীক্ষা করেন। তিনি রকেট থেকে মহাকাশের কিছু ময়লা সংগ্রহ করেন এবং মহাকাশযানে ফিরে আসেন।

এর আগে মহাশূন্যে কোন মানুষই নিজ মহাকাশযান ব্যতীত অন্য কোন বস্তু ছুঁয়ে দেখেননি। মাইকেল কলিন্সই প্রথম যিনি মহাকাশে অন্য কোন বস্তুতে হাত রাখেন।

এভাবে যতই পরীক্ষাযান পাঠানো হয় ততই বিজ্ঞানীরা আরও বেশি উৎসাহী হয়ে পড়েন। মাইকেল কলিন্সের যাত্রার পরে কনরেড এবং রিচার্ড গর্ডন পর-পর চারটি রকেটের সাথে মিলিত হন এবং দুবার মহাকাশে হাটেন। আর তাদের এ যাত্রায় তারা পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে ১৩৬০ কিলোমিটার উপরে ওঠেন।

একেবারে শেষের পরীক্ষাযানে এড উইন অলড্রিন মহাকাশের পথে পারিজমান। তিনি একনাগাড়ে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা কাল মহাকাশযানের বাইরে গিয়ে নানারকম

www.pathagar.com

পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। ওজনহীন অবস্থায় মানুষ কাজ করতে কতখানি সমর্থ হবে তা দেখার জন্যই তার এই এতক্ষণকাল মহাশূন্যে বিচরণ। এ পরীক্ষাটি থেকে সহজেই বুঝা যায় যে মানুষ ওজনহীন অবস্থায় চাঁদে কাজ করতে সমর্থ হবে।

জেমিনি মহাকাশযান দিয়ে মহাকাশে যাত্রা ১৯৬৬ সালের নবেম্বর মাস নাগাদ শেষ হয়ে যায়। চাঁদে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম প্রস্তুতিই নভোচারিগণ এ মহাকাশযান দিয়ে সম্পন্ন করে নেন। তাদের এ পরীক্ষা বিজ্ঞানী ও ডাক্তার-দের অনেক প্রশ্নের জবাব এনে দেয়।

এরপর তিনজন নভোচারীর দল অ্যাপোলো মহাকাশযানে চারটি উড্ডয়ন অনুশীলন শুরু করেন। কিন্তু এ শেষযানের অনুশীলন একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা বয়ে আনে। দুর্ঘটনাটি ঘটে ক্যাপকেনেডির মহাকাশযান উড্ডয়ন কেন্দ্রে। দিনটি ছিল ১৯৬৭ সনের জানুয়ারীর এক সুন্দর সকাল। একটি এপোলোযান ৬৫ মিটার লম্বা একটি রকেটের মাথায় বসানো ছিল। যানের ভেতর স্পেসস্যুট পরিহিত নভোচারীরাও ছিলেন। তারা হলেন ভার্জিল গ্রিসম, এডওয়ার্ড হোয়া-ইট (প্রথমে আমেরিকান নভোচারী যিনি মহাকাশে হাটেন) এবং রোজার চেফি (CHAFFEE)। কন্ট্রোল টাওয়ারে এবং প্রকৌশলিগণ যাত্রার প্রারম্ভিক ঘোষণা করছিলেন।

এপোলোর হ্যাচ (দরজা) বন্ধ ছিল এবং নভোচারীরা তাদের কন্ট্রোলের কাজ পরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ একজন আগুন বলে চেচিয়ে উঠলেন। আর সাথে সাথেই প্রচণ্ড শব্দে তীব্র আলোর বিচ্ছুরণের মাধ্যমে ঘন ধূঁয়া অ্যাপোলো যানটিকে ঘিরে ফেলল।

নভোচারীরা অনেক চেষ্টা করেও অ্যাপোলোর দরজা খুলতে পারলেন না। তারা তখন চেচাচ্ছিলেন আমাদের এখানে আগুন লেগেছে। আমরা পুড়ে যাচ্ছি। আমাদের তাড়াতাড়ি বের করে নিয়ে যাও। আগুনের ফুলকি দেখার সাথে সাথেই রেসকিউ-এর লোকেরা অনেক কষ্টে ধূঁয়ার মধ্য দিয়ে গিয়ে অ্যাপো-লোর দরজা খুলে ফেলে। তাদের এপোলোর ভেতর পৌঁছুতে তিন মিনিটেরও কম সময় লেগেছিল। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। ততক্ষণে তিনজন নভোচারীই মারা গেছেন।

www.pathagar.com

এ তিনজন নভোচারীর মৃত্যু তাদের পরিবার ছাড়াও আরো অনেকের মনে তীব্র বেদনার জন্ম দেয়। অন্য নভোচারীরা তাদের বন্ধু বিয়োগের ঘটনা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেন। কিন্তু এ দুর্ঘটনার রহস্য অনাবৃতই থেকে যায়। যেসব লোকেরা যানটিকে পরীক্ষা করেন তারা এতে কোন যান্ত্রিক ভুল দেখেননি। কিন্তু তারা নভোযানের নক্‌শার মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি খুঁজে পান যার জন্য দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই আরো নিরাপদ ভাবে বানানোর জন্য এরপর অ্যাপোলো যানের অনেক পরিবর্তন সাধন করা হয়।

আর পরিবর্তনই আমেরিকার চাঁদে ভ্রমণের পরিকল্পনাকে দুবছর পিছিয়ে নিয়ে যায়। এসময়ে রাশানরাও আবার একটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। তারা সুয়্যুজ নামে খুবই উন্নত ধরনের মহাকাশযান মহাকাশে পাঠায়। কিন্তু যানটি ২৬ ঘণ্টা মহাকাশে বিচরণের পর ধ্বংস হয়ে যায়। এ যানটি দ্বারা যদি রাশানরা চাঁদে যাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকে তবে বলতে হবে এ দুর্ঘটনা তাদের বেশ চিন্তায় ফেলে।

এসময়ে ১৯৬৮ সনের অক্টোবরে আবার অ্যাপোলোর পরীক্ষাযান উড্ডয়ন শুরু হয়। ওয়াল্টার স্কিরা, ডন এইসিলি এবং ওয়াল্টার কানিংহাম নামক তিনজন নভোচারী অ্যাপোলো যানে করে প্রায় ১১ দিন মহাকাশে কাটিয়ে আসেন।

এসময়ে তারা পৃথিবীর চারিদিকে ১৬৩ বার ঘুরে আসেন। এ যাত্রায় কোন গোলযোগ হয়নি। অ্যাপোলো মহাকাশযান সঠিকভাবে কাজ করার ফলে এদের মুখে আবার হাসি ফিরে আসে। তারা খেলাধূলা ও কন্ট্রোল সেন্টারের লোকদের সাথে হাসিতামাশা শুরু করেন।

দুমাস পর ফ্রাংক বর্মেন, জেম্‌স লভেল এবং উইলিয়াম এণ্ডার্স সর্বপ্রথম চাঁদকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে আসেন। তারা ক্রিস্টমাসের আগের দিন চাঁদের নিকট পৌঁছে একটি কক্ষপথে ঘুরতে থাকেন। তারা ক্রিস্টমাসের দিন তাদের স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের কথা চিন্তা করেন এবং একসাথে ডিনারের কথাও ভাবতে থাকেন। এ সবকিছুর হারানোর কথা ভাবলে কি হবে তাদের জন্য যাত্রার সময় আলাদা করে প্যাকেটে খাবার দেয়া হয়েছিল ক্রিস্টমাসের জন্য। আর তার ওপর লেখা ছিল "**HAPPY CHRISTMAS**"।

অ্যাপোলো যানটি চাঁদের চারিদিকে দশপাক ঘুরে আবার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে। অ্যাপোলোর পরীক্ষাযানে নভোচারিগণ এবার পৃথিবীর চারিদিকে

www.pathagar.com

একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ডকিং কার্য অনুশীলন করেন। অ্যাপোলোর শেষ পরীক্ষাযানে তারা চাঁদের চারিদিকে একটি কক্ষপথে ঘুরে আসেন। চাঁদের চারিদিকে ঘোরার সময় যানের যে অংশটা চাঁদে অবতরণ করবে তা নিয়ে পরীক্ষা করেন। এ যানটিকে বলা হয় লুনার মডিউল। তাঁরা প্রথমে এটাকে মূলযান থেকে ছুটিয়ে দেন। এসময়ে জন ইয়াং কমাণ্ড মডিউলে থেকে যান এবং অপর দুজন EUGENE CERNAN এবং টম স্টেফর্ড লুনার মডিউলে চড়ে বসেন। তাঁরা চাঁদের পৃষ্ঠ হতে মাত্র ১৫ কিলোমিটার উর্দ্ধে অবতরণ করেন। তারপর তারা আবার উপরে উঠে মূলযান এপোলোর সাথে সংযুক্ত হন।

প্রথম থেকে শুরু করে অনেক নভোচরী আলাদা ভাবে এপোলোর পরিকল্পনা মত কাজ করেন। একটিমাত্র দুর্ঘটনা ব্যতীত সবকিছু তাদের পরিকল্পনা মতই হয়। তাই ইয়াং, স্টেফর্ড এবং স্যারনানের চাঁদের চারিদিকে ঘুরে আসার পর আমেরিকানদের আর পরীক্ষাযান পাঠানোর প্রয়োজন হয়নি। এসময়ে অবশ্য মানুষবিহীন নভোযান চাঁদের বুকে অবতরণ করে চাঁদের পৃষ্ঠ সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করে।

অনেক প্রোব চাঁদের বিভিন্ন স্থানে অবতরণ করে এবং চাঁদের মাটি অ্যাপোলো-যানকে আগলে রাখার জন্য কতটা শক্তিশালী তা পরীক্ষা করে। তাদের পরীক্ষায় জানা যায় যে চাঁদের মাটি অ্যাপোলো যানকে আগলে রাখার জন্য প্রয়োজন মত শক্তিশালী।

অন্যান্য প্রোব চাঁদের অভ্যন্তরের অনেক ছবি তোলে পৃথিবীতে পাঠায়। এসব ছবি চাঁদের বিভিন্ন স্থানের পাহাড় পর্বত ও মারাত্মক ফাটলের স্থান চিহ্নিত করে।

এসব ছবি হতে বিজ্ঞানীরা চাঁদের অভ্যন্তরের একটি ম্যাপ অংকন করেন। নাসার বিজ্ঞানীরা এসব ম্যাপ হতে চাঁদের বুকে নিরাপদ অবতরণের জায়গা খুঁজে বের করেন। নিরাপদে অবতরণের জন্য তারা পাঁচটি জায়গা চিহ্নিত করেন। অবশেষে ট্রানকোয়াইল্লিটি সাগরের পাশে মানুষ অবতরণের জায়গা ঠিক করা হয়।

———

www.pathagar.com

৭

উড্ডয়নের জন্য প্রস্তুতি

চাঁদে যাওয়ার জন্য যেসব পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার ছিল আমেরিকানরা তার সব সমাধা করে উড্ডয়নের অপেক্ষা করতে থাকেন। এসময় সবার মনেই প্রশ্ন জাগে কোন তিনজন নভোচারীকে পছন্দ করা হবে। আমেরিকার তখন ৫২ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নভোচারী ছিলেন এবং তাদের বেশির ভাগের ইচ্ছাই ছিল সর্বপ্রথম চাঁদের মাটিতে পা দেয়া। অনেক আলোচনার পর নাসার কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানিগণ তিনজন নভোচারীকে বাছাই করেন চাঁদের পথে পাড়ি জমানোর জন্য। তাঁরা হলেন নেইল আর্মস্ট্রং, এড উইন অলড্রিন এবং মাইকেল কলিন্স। আর্মস্ট্রংকে এ যাত্রার অধিনায়ক ঠিক করা হয়। আরো ঠিক হয় যে আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন চাঁদে নামবেন আর মাইকেল কলিন্স মূলযানে করে চাঁদের চারিদিকে কক্ষপথে ঘুরে আসবেন।

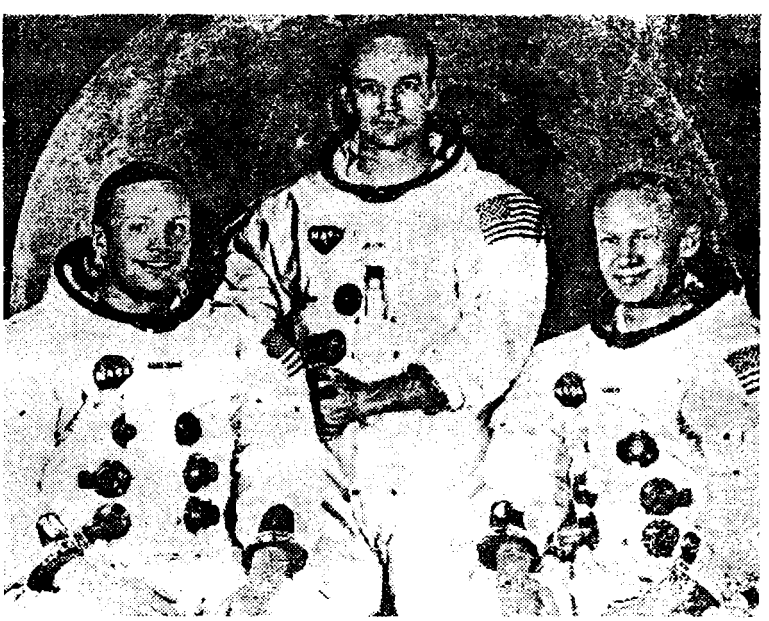

"অ্যাপোলো দুই"-এর নভোচারিগণ নেইল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স এবং এডউইন অলড্রিন।

www.pathagar.com

নির্বাচিত তিনজনের সকলেরই বয়স প্রায় সমান ছিল। তাদের বয়স ছিল আটত্রিশ কি উনচল্লিশ। নভোচারী হওয়ার আগে তারা সকলেই উচ্চদরের বৈমানিক ছিলেন। তাদের সকলেরই মহাকাশে যাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল প্রায় ছয় থেকে সাত বছরের। তারা জেমিনি মহাকাশযানে করে অনেক পরীক্ষা কার্য চালিয়ে ছিলেন।

এ তিনজন নভোচারীর সকলেই বিবাহিত ছিলেন। আর তাদের ছেলেমেয়েও ছিল। আর্মস্ট্রং-এর দুটি ছেলে ছিল আর কলিন্স ও অলড্রিন উভয়ের তিনজন করে সন্তান ছিল। চাঁদে যাওয়ার নভোচারী হিসাবে যোগদান করতে পেরে তারা অবশ্যই বেশ আনন্দিত হয়ে পড়েন কিন্তু তাদের স্ত্রীরা নিশ্চয়ই মনে মনে খুব ভীত হয়ে পড়েন। তাদের ছেলেমেয়েরা মহাকাশে ভ্রমণের দুর্ঘটনা সম্বন্ধে কিছু জানার মত বয়স ছিল না। আর তারা এতে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। কেউ কেউ তার বন্ধুদের বলতে লাগল, "আমার বাবা চাঁদে যাচ্ছে"।

এ তিনজনকে ছাড়াও নাসা আরও দুজন ক্রু বাছাই করে রাখেন। যাত্রার আগে যদি এ তিনজনের কারো শারীরিক কিংবা মানসিক দুর্বলতা ধরা পড়ে তবে তার পরিবর্তে এ দুজনের একজন ক্রুকে পাঠানোর জন্য এ ব্যবস্থা।

আর্মস্ট্রং, অলড্রিন ও কলিন্স এবং অন্য দুজন অতিরিক্ত ক্রু একসাথে অনেক সপ্তাহ সিমিউলেটরে নানারকম প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তাঁরা উড্ডয়নের সবরকম নিয়ম কানুন করায়ত্ত করেন। আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন কাল্পনিক চাঁদে অবতরণ করেন এবং সেখানে হাঁটাচলা করেন। তাদের প্রত্যেকদিন সবরকম অনুশীলন বারবার করানো হয়।

এরই মধ্যে কয়েকশত প্রকৌশলী চাঁদে যাওয়ার যানটি তৈরি করে ফেলেন। এটা ছিল এক বড় ধরনের কাজ। এ "অ্যাপোলো-১১" নভোযানটি ছিল প্রায় ২৫ মিটার লম্বা এবং ওজন ছিল ৪৫,০০০ কিলোগ্রাম। এ যানটিকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভনব্রাউন "সেটার্ন ফাইভ" নামে একটি তিন ধাপ রকেট তৈরি করেন। এটার উচ্চতা ছিল প্রায় পঁচাশি মিটার এবং ওজন ছিল প্রায় ২৭০০ টন। প্রায় দুই মিলিয়ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের সাহায্যে রকেটটি তৈরি করা হয়। এতে স্বনিয়ন্ত্রিতভাবে চলার ব্যবস্থা ছিল আর ছিল ১১টি উচ্চক্ষমতা-সম্পন্ন ইঞ্জিন। শত শত ফ্যাক্টরী থেকে তৈরি এসব যন্ত্রাংশ বয়ে নিয়ে এসে চাঁদের যানটি তৈরি করা হয়।

www.pathagar.com

ফ্যাক্টরীগুলি হতে এসব যন্ত্রাংশ স্থল, জল ও আকাশ পথে স্পেস সেন্টার 'মুনপোর্ট' এ নিয়ে আসা হয়। আর সেগুলি ব্যবহার করে প্রকৌশলিগণ একটি ইস্পাতের GANTRY-এর উপর চাঁদে যাওয়ার যানটি তৈরি করেন। এ ইস্পাতের GANTRY-কে বলা হয় MOBILE LAUNCHER এটা প্রায় ১৫০ মিটার লম্বা ছিল এবং এটার ১৭টি প্লাটফর্মবিশিষ্ট একটি টাওয়ার ছিল।

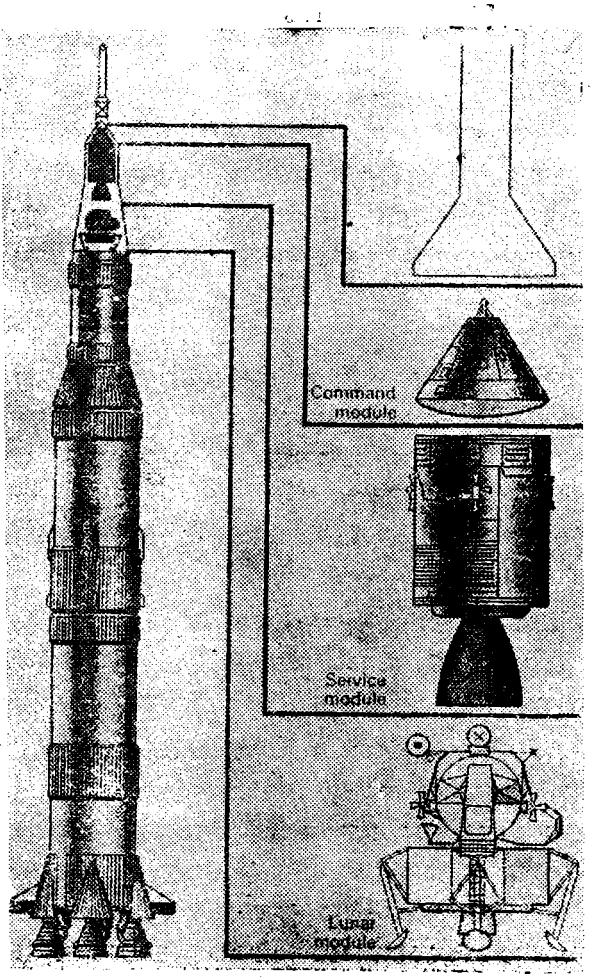

অ্যাপোলো নভোযানটির তিনটি অংশ।

www.pathagar.com

লোকজন টাওয়ারের প্লাটফর্মে উঠে রকেট ও নভোযান তৈরি করেন। গেনাট্রি থেকে লম্বা লম্বা হাত বেরিয়ে থেকে রকেট ও নভোযানটিকে উড্ডয়নের আগে ধরে রাখে।

তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বিজ্ঞানী ও প্রকৌশিগণ মুন-শিপটিকে পরীক্ষা করেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে চাঁদে যাওয়ার তরি-টিকে মুনশিপ বলে। এটার প্রতিটি অংশ ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা তারা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখেন।

ওয়ার্কশপ থেকে ক্যাপ কেনেডি উড্ডয়ন স্থানের দূরত্ব ছিল প্রায় সাত কিলো-মিটার কিন্তু এ সাত কিলোমিটার পথ রকেট ও যানটিকে বয়ে নিয়ে যাওয়া ছিল দুরূহ ব্যাপার কারণ এটির ওজন ছিল প্রায় আট হাজার টন। ফলে তারা এমন একটি যান ব্যবহার করেন যা এটাকে অতি নিরাপদে উড্ডয়ন স্থানে নিয়ে যেতে পারবে।

বিজ্ঞানীরা যানটির নাম দেন ক্রলার্স (CRAWLERS) এ যানটি ছিল প্রায় চৌচল্লিশ মিটার লম্বা এবং আটত্রিশ মিটার প্রশস্ত। আর এটার প্লাট-ফর্মটি ছিল একটি ফুটবলের মাঠের অর্ধেকের সমান। এখন এ যানটি যে রাস্তা দিয়ে যাবে সে রাস্তাটিকেও তো খুবই শক্তিশালী বানাতে হবে। তাই তারা দুই মিটারেরও বেশি মোটা কংক্রিটের রাস্তা তৈরি করেন। এ ক্রলার যানটির সর্বমোট আঠারোটি ইঞ্জিন তৈরি করা হয়েছিল দুটি ক্রলার রকেট ও নভোযান-টিকে বহন করার জন্য।

বড় বড় ক্রেন দ্বারা মোবাইল লাঞ্চারটিকে যানটির প্লাটফর্মে ওঠানো হয়। যানটি এতই ভারী হয়ে পড়ে যে চলার সময় রাস্তাটি প্রায় তিন সেন্টিমিটার ডেবে-যায়। রওনা হওয়ার প্রায় তিনচার ঘণ্টা পর এটা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে।

সেখানে মুনশিপটিকে কংক্রিটের তৈরি LAUNCH PAD-এর ওপর বসানো হয়। এবস্থায় এটার উচ্চতা হয় প্রায় একশত দশমিটার যা কিনা ছত্রিশ তলার সমান। মানুষকে চাঁদে নিয়ে যাবে যে অ্যাপোলো যানটি এবার সেটার দিকে মনোনিবেশ করা যাক। এযানটি একটি সেটার্ন রকেট এর নাকে বসানো থাকে। এটার তিনটি অংশ কমাণ্ড মডিউল থাকে সবচেয়ে ওপরে মাঝখানে সার্ভিস মডিউল এবং এর নিচে লুনার মডিউল। নভোচারিগণ কমাণ্ড মডিউলে চড়ে যাত্রা করেন। এ অংশে অক্সিজেনের সঠিক সরবরাহ এবং বাতাসের চাপ ঠিক থাকে বলে

www.pathagar.com

নভোচারিগণ সহজেই শ্বাসকার্য চালাতে পারেন। মহাকাশযানটির উচ্চতা অনুযায়ী এ অংশের অভ্যন্তরের বায়ুর চাপ ও তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় না বলে নভোচারিদের সব সময়ে স্পেসস্যুট বা মহাকাশের পোশাক পড়ে থাকতে হয় না। তারা তাই যাত্রার বেশির ভাগ সময় আরামদায়ক কাপড় ব্যবহার করেন। এগুলিকে বলা হয় ফ্লাইট কভারেন্স কিন্তু কোন জটিল আর মারাত্মক কাজ করতে গেলে তাদের অবশ্যই মহাকাশের পোশাক পড়ে নিতে হয়। তারা উড্ডয়ন, ডাকিং ও চাঁদে অবতরণের জন্য এ পোশাকটি পরিধান করেন। এছাড়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আবার প্রবেশ করার জন্যও তারা এ পোশাকটি ব্যবহার করে থাকেন।

কেবিনের ভেতর তিনটি কোচ থাকে। এগুলি দেখতে অনেকটা ভাজ করা বিছানার মত। যানটিকে পরিচালনা করার জন্য সকল যন্ত্র এ কোচের উপরের দেয়ালে লাগানো থাকে। ফলে নভোচারীরা শুয়ে থেকেই অতি সহজে সেগুলি ব্যবহার করতে পারেন। নানা রকম জটিল ও মারাত্মক কর্মশক্তি প্রয়োগের সময় নভোচারিদের জন্য এ কোচে শুয়ে থাকাটাই সবচেয়ে নিরাপদ অবস্থান। নভোচারিগণ তাদের কোচ বা স্লিপিং ব্যাগে ঘুমাতে পারেন। তবে স্লিপিং ব্যাগে ঘুমাতে হলে তাকে ব্যাগটিকে মেঝের সাথে আটকে নিতে হবে। তা না করলে ব্যাগ শুদ্ধ ভাসতে থাকবেন।

নভোচারীদের জন্য খাবার নেয়া হয় তা যানের চারিদিকে দেয়ালের মাঝে নির্দিষ্ট স্থানে জমিয়ে রাখা হয়। খাবারগুলি শুকনো ও হিমায়িত থাকে। যখন কারো খেতে ইচ্ছা করে তখন তিনি শুকনো খাবারগুলিকে প্লাস্টিক ব্যাগের ভেতরে পানিতে মিশ্রিত করে তারপরে গ্রহণ করেন। এ খাবার তাদের কাছে খুব একটা মজা না লাগলেও এগুলি তাদের চাহিদা পূরণ করে দেহের সুস্বাস্থ্য রক্ষা করে।

এছাড়া কেবিনের ভেতর নানারকম ঔষধও থাকে। যাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তা থেকে নিরাময় পাওয়া যায় সেজন্য এব্যবস্থা। মকাণ্ড মডিউলটিতে নানারকম যন্ত্রপাতি, নামার জন্য প্যারাস্যুট এবং জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থাকে। এতে নভোচারীদের জন্য ভাঁজ করা রাবারের নৌকাও থাকে।

সার্ভিস মডিউলটি প্রোবের জন্য জ্বালানি ও রকেট ইঞ্জিন বহন করে। এছাড়া এটার গায়ে এরকম সেল বা কোষ থাকে যা সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। এ উৎপাদিত বিদ্যুৎ রকেট ও যানের হাজার হাজার যন্ত্রাংশের বিদ্যুতের

www.pathagar.com

চাহিদা পূরণ করে। এভাবে আবার গ্যাস থেকে বিশুদ্ধ পানিও উপন্ন করা হয়। এ অংশের আরেকটা বড় কাজ হল ক্রুদের কেবিনের বাতাসের চাপ ও তাপ-তাপমাত্রা ঠিক রাখা। এছাড়া এদের কেবিনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনও এ অংশে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। সার্ভিস মডিউলটি চাঁদে যাওয়ার জন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিস যোগান দেয়।

লুনার মডিউলটি দুভাগে বিভক্ত থাকে। উপরের অংশে দুজন নভোচারীর জন্য একটি কেবিন থাকে। যারা চাঁদে নামবেন তাদের জন্য এ কেবিনটি আর নিচের অংশটিতে অবতরণের জন্য নানারকম যন্ত্রাংশ থাকে। এ অংশটির চারটি পা থাকে যার উপর ভর করে এটা চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকবে। যখন আবার চাঁদ থেকে উড্ডয়নের সময় হবে তখন উপরের অংশটি নিচের অংশটিকে LAUNCHING PAD হিসাবে ব্যবহার করে চাঁদের মাটিতেই ফেলে রেখে যাবে। নিচের অংশটিতে ক্যামেরা যন্ত্রপাতি ও নানারকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাংশও থাকে যা দ্বারা নভোচারিগণ চাঁদের পৃষ্ঠে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা কার্য চালান।

এরই মধ্যে ঠিক করা হয় যে ১৯৬৯ সনের ১৬ই জুলাই তারিখে মানুষ চাঁদের পথে পাড়ি জমাবে। যাত্রার পাঁচদিন আগে কাউন্ট ডাউন (একটা সময় সাপেক্ষ এবং জটিল যন্ত্রকৌশলগত প্রণালী) শুরু হয়। উড্ডয়ন কেন্দ্রে ক্রুরা মুনশিপটিকে উড্ডয়নের জন্য সব প্রকার কার্যাদি সম্পন্ন করে ফেলেন। এসব কাজের জন্য শত শত লোক নিয়োগ করা হয়।

এরই মধ্যে ডাক্তারগণ এপোলোর তিন নভোচারী আর্মস্টং, অলড্রিন এবং কলিন্সের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। তাদের শরীরে যাতে কোন রোগজীবাণু প্রবেশ করতে না পারে তাই যাত্রার আগের দুসপ্তাহ ক্রুদেরকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে রাখা হয়। এবস্থায় ক্রুদের স্ত্রী এবং ট্রেইনারদের ব্যতীত আর কাকেও তাদের সাথে দেখা করতে দেয়া হত না। স্বতন্ত্রভাবে থাকাকালীন তিনজন নভোচারী এবং অতিরিক্ত দুজন ক্রু মহাকাশ কেন্দ্রের নিকট একটি বিশেষ অট্টালিকায় সময় কাটান। যখন তাদের স্ত্রীরা তাদের দেখতে যেতেন তখন তাদের একটি জীবাণু মুক্ত ঘরে নিয়ে যাওয়া হত। ঘরের এ রুমটিকে কাচের পর্দা দিয়ে দুভাবে বিভক্ত থাকত নভোচারী ও তার স্ত্রী এ পর্দার দুপাশে থেকে পরস্পর কথা বলতেন।

www.pathagar.com

যাত্রার কিছুদিন পূর্বে ডাক্তাররা প্রত্যেক নভোচারীকে চার ঘণ্টা যাবৎ পরীক্ষা করেন। এসময় তাদের স্বাস্থ্য বেশ ভালই ছিল। যাত্রার পূর্বদিনে নভোচারিগণ সব প্রকার ট্রেনিং বাদ দিয়ে বিশ্রাম নেন। পূর্বরাত্রে তারা দুজন অতিরিক্ত ক্রু এবং ট্রেইনারগণ একটি ছোট খাট পার্টি দিয়ে একসাথে ডিনার করেন। এরপর নভোচারিগণ সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েন। তারা সে রাত্রে ছয় থেকে আটঘণ্টা ঘুমান। একজন ডাক্তার ভোর চারটার সময় তাদের উঠিয়ে পরীক্ষা করেন। তাদের স্বাস্থ্য তখন রওনা দেয়ার জন্য বেশ ভালই ছিল। তাই ডাক্তার তখন ঘোষণা করেন "অ্যাপোলো এগার-এর ক্রুগণ যাত্রার জন্য প্রস্তুত।"

ঘুম থেকে জাগার পর নভোচারিগণ মাংস, ডিম, কফি, কমলার রস দিয়ে সকালের নাস্তা সারেন। এটাছিল নয় দিনের জন্য তাদের শেষ নাস্তা। এরপর তারা টেলিফোনের মাধ্যমে তাদের স্ত্রীদের শুভবিদায় জানান। জেনিট আর্মস্ট্রং এবং তার দুই ছেলে রকেটের উড্ডয়ন দেখার জন্য ক্যাপ কেনেডিতে যায়।

জোয়ান অলড্রিন ও প্যাকলিন্স উড্ডয়ন টেলিভিশনে দেখারই সিদ্ধান্ত নেন। তবে তাদের খুব একটা শংকাগ্রস্ত মনে হয়নি। আর যদিও তারা হয়েছিলেন তবুও স্বামীদের কাছ থেকে লুকানোর জন্য হাসি-খুশী ভাবেই বিদায় জানান এবং শুভ কামনা করেন।

নাস্তার পর নভোচারীদের স্পেসস্যুট পরিয়ে উড্ডয়ন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা ছিল এক সুন্দর সকাল। তখন সবেমাত্র সূর্য উঠছিল। আর আকাশে মেঘের ঘনঘটা ছিল না। উড্ডয়নের জন্য এটা ছিল এক সুন্দর পরিবেশ। বৃহৎ মুনশিপটির উড্ডয়নের সময় ক্যাপ কেনেডি উড্ডয়ন কেন্দ্রে প্রায় একমিলিয়ন লোকের সমাবেশ হয়। আমেরিকা ছাড়াও প্রায় ৮০টি দেশ থেকে লোকজন এ সময় উড্ডয়ন কেন্দ্রে হাজির হয়। সব জায়গাতেই তখন একরকম উত্তেজনা। সবার মুখেই তখন চাঁদের কথা। সকাল সাড়ে ছটার দিকে আর্মস্ট্রং, অলড্রিন ও কলিন্স স্পেস সেন্টারে এসে হাজির হন। বাইরে জমায়েত লোকজন তাদের দেখতে পায়নি ঠিকই কিন্তু প্রায় পাঁচশত কর্মচারী তাদের শুভেচ্ছা জানান। তারা তালি দিয়ে নভোচারীদের মনোরঞ্জন করেন। এ সময় নভোচারীরা হাত তোলে তাদের বিদায় দিয়ে লাঞ্চিং প্যাডের দিকে অগ্রসর হন।

মুনশিপটি উড্ডয়নের জন্য আকাশের দিকে মুখ করেছিল। এ সময় ভন-ব্রাউন এবং তার একটি বৃহৎ প্রকৌশলীর দল রকেটের প্রায় দুই মিলিয়ন যন্ত্রাংশ

www.pathagar.com

ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখেন। রকেটটি জ্বালানি দ্বারা পূর্ণ করা হয়। অ্যাপোলোর উড্ডয়নের জন্য রকেটটির প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন লিটার জ্বালানির প্রয়োজন হয়।

নভোচারিগণ মোবাইল লাঞ্চারের টাওয়ারে উঠে তারপর তাদের কেবিনে প্রবেশ করেন। এরপর ক্রগণ কন্ট্রোল টাওয়ারের সাথে সব রেডিও যোগাযোগ ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখেন।

মাটিতে যে কন্ট্রোলার থাকেন মিশন কন্ট্রোল উড্ডয়ন থেকে অবতরণ পর্যন্ত সব কার্যসম্বন্ধে নভোচারীদের নির্দেশ দেন। নভোচারীরা সব সময় তাদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন। কন্ট্রোল সেন্টারে উড্ডয়নের সময় প্রায় চল্লিশ হাজার লোক কার্যরত ছিলেন। এখানে বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী এবং পরীক্ষাযানে যারা মহাকাশে গিয়েছিলেন তারাও ছিলেন। তারা অ্যাপোলো যানের নানারকম পরীক্ষা কার্য সাধন করে সেদিনের সঠিক উড্ডয়নের পথ করে দিয়েছিলেন। কন্ট্রোলটাওয়ার থেকে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়। এ সময়ে টিভি স্ক্রীনে তাদের অবস্থা দেখা যাচ্ছিল। পৃথিবীতে ফিরে না আসা পর্যন্ত কন্ট্রোল টাওয়ার ও নভোচারীদের প্রায় সর্বক্ষণই রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ থাকে।

নভোচারী ও কন্ট্রোলারগণ তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা আবারও পরীক্ষা করে দেখেন। এক সময়ে সব প্রস্তুতিপর্ব শেষ হয়ে এল।

অবশেষে সাড়ে নটার দিকে যাত্রার সময় ঘনিয়ে আসে। এখন শুধু অপেক্ষা।

———

www.pathagar.com

৮

চাঁদের পথে যাত্রা

আর্মস্ট্রং, কলিন্স, অলড্রিন উড্ডয়নের জন্য তাদের কোচে শুয়ে অপেক্ষা করছেন। কন্ট্রোল সেন্টারে সবাই তখন টি.ভি. পর্দার দিকে তাকিয়ে আছেন এবং বার বার ঘড়ি দেখছেন। বাইরের মানুষের ভীড়ও যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে। চারিদিকে টু শব্দটিও নেই। সারা পৃথিবী জুড়ে টি. ভি. পর্দার সামনে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতীক্ষা উড্ডয়ন কার্য দেখার জন্য।

অবশেষে যাত্রা আরম্ভ হওয়ার শেষ দশ সেকেণ্ড গোনা শুরু হল। দশ-নয়-আট সাত-ছয়-পাঁচ-চার-তিন-দুই-এক...LIFT OFF। সাথে সাথে কন্ট্রোলার বললেন "আমরা উড্ডয়ন করেছি।" এর সাথে সাথেই প্রচণ্ড শব্দের সাথে বৃহৎ মুনশিপটি আকাশের দিকে যাত্রা শুরু করে। শব্দটা বজ্রের চেয়েও বেশি। এতে মানুষের কানের পর্দা ফেটে যাওয়াও কোন অদ্ভুত ব্যাপার নয়। রকেটটির উড্ডয়নের শব্দে সারা মহাকাশ কেন্দ্রটি কাপতে শুরু করে।

বহু আকাঙ্ক্ষিত জনতা এ সময় উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তারা নানাভাবে রকেটের নভোচারীদের শুভকামনা করেন এবং হাততালি দিতে থাকেন। জেনিট আর্মস্ট্রংকে এ সময় বেশ বিচলিত দেখা যায়। হয়তো বা জেমিনি নভোযানে তার স্বামীর মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসার কথাই তার মনে হচ্ছিল। জোয়ান অলড্রিন এবং প্যাট কলিন্সও এ সময় বেশ বিচলিত হয়ে পড়েন। এ সময় কালো মেঘের ন্যায় ধূঁয়া ও কমলা রংয়ের আগুনের ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে রকেটটি আকাশের মাঝে হারিয়ে যায়।

উড্ডয়নের পর রকেটের ভেতরে চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং এক সময় বৃহদাকার ধারণ করে। এবস্থায় স্বভাবতই নভোচারীরা বেশ কষ্টবোধ করছিলেন। তবে দু-একমিনিটের মধ্যে চাপ বেশ কমে যায় এবং নভোচারীরা স্বস্তি ফিরে পান। প্রচণ্ড গতিবেগের মাধ্যমে সেটার্ন রকেটটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কাটিয়ে যানটিকে মহাকাশের দিকে নিয়ে যেতে থাকে।

www.pathagar.com

রকেটের প্রথম ধাপটি এটাকে বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে ঘনস্তরের মধ্যদিয়ে নিয়ে যায়। তখন এর গতিবেগ ছিল প্রায় ৯৬০০ কিলোমিটার/ঘণ্টা। পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে প্রায় চৌষট্টি কিলোমিটার উপরে যাওয়ার পর রকেটের প্রথম ধাপটি পুড়ে খসে যায়। তখন দ্বিতীয় ধাপের ইঞ্জিন রকেটটিকে বয়ে নিয়ে যেতে থাকে। দ্বিতীয় ধাপটি যানটিকে পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে ১৬০ কিলোমিটার উর্ধ্বে নিয়ে যায়। তখন এর গতিবেগ ২৪০০০ কিলোমিটার/ঘণ্টা। শেষের ধাপটি আর একটু উপরে উঠে অ্যাপোলো যানটিকে পৃথিবীর চারিদিকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ছেড়ে দেয়। প্রোবটি যখন পার্কিং অরবিটে থাকে তখন রকেটের শেষ ধাপটিও এর সাথে থেকে যায়। তবে এটার ইঞ্জিন আপনাতেই এক সময় বন্ধ হয়ে যায়। নভোযান থেকে আর্মস্ট্রং ঘোষণা করেন যে, "সেটার্ন রকেটটি আমাদের বেশ ভাল একটি যাত্রা উপহার দিয়েছে।" এ মন্তব্যে ভন ব্রাউনকে বেশ খুশী দেখা যায়। নভোচারিগণ এরপর গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান থেকে চাঁদে যাওয়ার পথে তাদের অবস্থান নির্ণয় করেন। এটা এক জটিল গাণিতিক সমস্যা। মানুষ চাঁদের দিকে সরাসরি কোন যান পাঠাতে পারে না। কারণ পৃথিবীর সাথে সাথে চাঁদও একস্থানে না থেকে ক্রমাগত ঘুরতে থাকে। আর রকেটকে চাঁদে যেতে কমপক্ষে তিনদিন দরকার। এ তিনদিনে চাঁদ নিশ্চয়ই আগের স্থানে না থেকে অনেক দূরে সরে যায়। তাই নভোচারীদের অংক করে বের করতে হয় ঠিক তিনদিন পর চাঁদটি কোথায় থাকবে এবং ঐ দিক উদ্দেশ্য করেই তারা রওয়ানা হন। যানের কৌণিক দূরত্ব অবশ্যই একেবারে সঠিক হতে হবে কারণ রকেট ছাড়ার সময় কৌণিক দূরত্বের যদি একচুল পরিমাণ ভুল হয়। তবে মানুষ আর চাঁদে পৌঁছতে পারবেনা।

পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরার সময় নভোযানের সব যন্ত্রাংশ যখন ঠিকভাবে কাজ করতে লাগল তখন কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে তাদের চাঁদের পথে যাত্রার নির্দেশ করেন। এবস্থায় ঠিক সময়মত রকেটের ইঞ্জিনটি আবার চালু হয়ে যায় এবং রকেটটিকে ঠিক কৌণিক দূরত্বে ঠেলে দেয়। পাঁচ মিনিটের পর রকেটের এ ধাপটি পুড়ে যায় তবে এ সময় প্রোবের গতিবেগ উঠে দাঁড়ায় ঘণ্টায় চল্লিশ হাজার কিলোমিটার। এরপর প্রোবটি ছিটকে পার্কিং অরবিট থেকে বের হয়ে যায় এবং বাধাহীন মুক্ত আকাশ বেয়ে চাঁদের পথে পাড়ি জমায়।

এ সময় রাশান একটি নভোযানও চাঁদের পথে যাচ্ছিল। রাশানরা তাদের নভোযান "লুনা পনেরো"-কে এপোলোর তিনদিন পূর্বে উড্ডয়ন করায়। তখন

www.pathagar.com

লুনা এপোলো থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার এগিয়ে ছিল। 'লুনা পনেরো' নভোযানটি অনেক বড় ছিল। তাই এতে আমেরিকানদের মধ্যে বেশ অনুসন্ধান করে জানা যায় "লুনা পনেরো" নভোযানটিতে কোন নভোচারী ছিল না। আর তাই আমেরিকানদের চিন্তারও অবসান ঘটে।

কিন্তু সেখানে আরেকটি বিপদ ছিল। সেটা হল লুনা পনেরো নভোযানটি অ্যাপোলোর সাথে লেগে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। মিশন কন্ট্রোল এ ঝুঁকি না নিয়ে সরাসরি রাশিয়ার মহাকাশ কেন্দ্রে টেলিফোন করে তাদের বিপদের কথা ব্যাখ্যা করেন। রাশানরা এতে বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করে। তারা যদিও যান পাঠানোর কারণই জানায়নি তবুও তারা সে যানের পথ সম্পর্কে পরিষ্কার এক ধারণা দিয়ে দেয়। আর এও কথা দেয় যে, অ্যাপোলোর গতিপথের সাথে তাদের নভোযানের গতিপথের কোন মিল থাকবে না। অবশেষে তারা আমেরিকার শুভ কামনা করে।

অ্যাপোলোর ক্রুরা এখবর শুনে বেশ স্বস্তি অনুভব করেন। কারণ এপোলো ধ্বংস হয়ে গেলেতো তাদের অবস্থা কি হবে তা বোঝাই যায়। এরপর নভোচারিগণ একটি জটিল কার্য সমাধা করেন। উড্ডয়নের সময় কমাণ্ড মডিউলটি সব সময় উপরের দিকে থাকে। কারণ এতে নভোচারীরা অনেক নিরাপদে থাকেন। হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা যদি ঘটে যায় তবে তারা কমাণ্ড মডিউলটিকে ছুটিয়ে দিয়ে জীবন বাঁচাতে পারবেন। লুনার মডিউলটি থাকে নিচের দিকে। সেজন্যই এটা থাকে কমাণ্ড আর সার্ভিস মডিউলের পেছনে। আর এটা যখন পেছনে থাকে তখন অবতরণ করাও সম্ভবপর নয়। তাই যে দুজন নভোচারী অবতরণ করবেন তাদের অবশ্যই এটার দিক পরিবর্তন করে ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। তাই তাদের অবতরণের অংশটিকে পেছনের পরিবর্তে সামনে আনতে হয়।

তারা নিম্নোক্ত উপায়ে পেছনের অংশটিকে সামনে আনেন। প্রথমে তারা লুনার মডিউলটিকে ছুটিয়ে দেন। তারপর সার্ভিস মডিউলে আরো শক্তি যোগানের জন্য তারা ষোলটি ছোট ছোট রকেট চালু করেন। তারপর তারা কমাণ্ড মডিউল ও সার্ভিস মডিউলটিকে লুনার মডিউল থেকে ছুটিয়ে ঘুরিয়ে লুনার মডিউলের পেছনে সংযোজন করেন। এখন কমাণ্ড মডিউল থেকে লুনার মডিউলে যাওয়ার একটি ছোট প্যাসেজ হয়ে যায়। এ কাজটি শেষ হয়ে গেলে নভোচারী আবার স্পেসসূট খুলে আরামদায়ক কাপড় পড়ে নেন। নভোচারীরা নক্ষত্র থেকে আবার মহাকাশে তাদের অবস্থান দেখে নেন।

www.pathagar.com

অতঃপর তারা পানির সাথে কিছু শুষ্ক খাবার মিশিয়ে মহাকাশে তাদের প্রথম খাওয়া সেরে নেন। খাবারটা খুব একটা মজাদার না হলেও এতে তাদের শরীরের প্রয়োজনীয় সব রকম কার্যই সমাধা হয়। আর তাদের খাবারের জন্য জমা খাদ্যের পরিমাণও ছিল বিপুল। তাই খাবার নিয়ে তাদের কোন চিন্তা করতে হয়নি। এ সময় নভোচারী তিনজন মহাকাশে একা ঠিকই কিন্তু পৃথিবী থেকে মানুষ তাদের টি.ভি. পর্দায় দেখছিলেন। চৌদ্দটি ট্রাকিং স্টেশন এবং অনেক জাহাজ ও বিমান এ সময় মহাকাশে অ্যাপোলোর অবস্থান চিহ্নিত করে কন্ট্রোল সেন্টারে পাঠায়। টি.ভি. পর্দায় এপোলোর অগ্রগতি দেখে নিচ থেকে বিজ্ঞানিগণ ও প্রকৌশলিগণ নভোচারীদের নানাবিধ পরামর্শ প্রদান করেন।

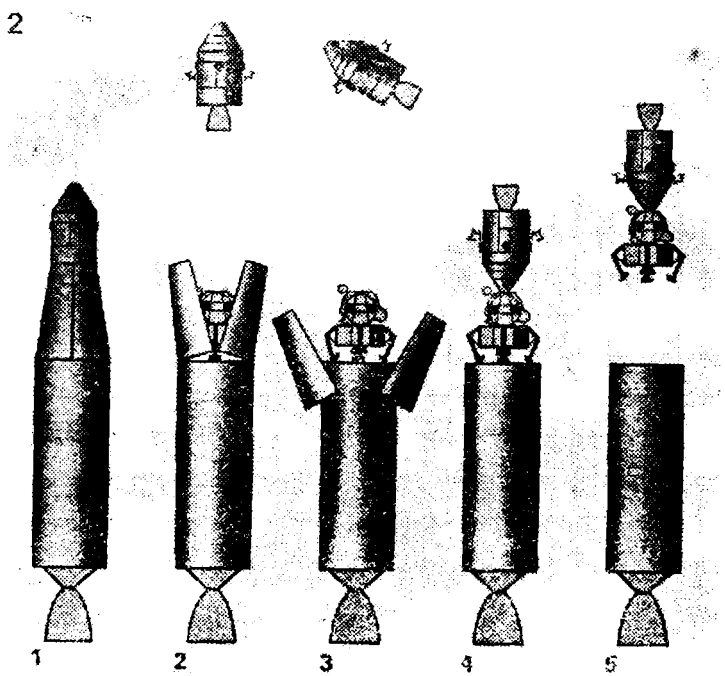

1. রকেটের তৃতীয় ধাপ।
2. কমাণ্ড এবং সার্ভিস মডিউলটি তৃতীয় ধাপ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে।
3. কমাণ্ড এবং সার্ভিস মডিউল দিক পরিবর্তন করছে।
4. লুনার মডিউলের সাথে কমাণ্ড এবং সার্ভিস মডিউল জোড়া নিচ্ছে।
5. সবগুলি একত্রে চাঁদের পথে যাত্রা করছে।

www.pathagar.com

এ সময় টেলিসেট্র নামে একটি স্বনিয়ন্ত্রিত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রোবটির যন্ত্রাংশ সম্পর্কে নিজে নিজেই নানাবিধ সংকেত পাঠায়। 'সেন্সরস' নামে একটি স্বনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র এপোলোর অভ্যন্তরস্থ সব যন্ত্রাংশ ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখে। এতে কোন ভুল ধরা পড়লে তা সাথে সাথে সংকেত পাঠায়। এটা ক্রুদের জন্য পানি ও অক্সিজেন সরবরাহ ঠিক আছে কিনা তাও পরীক্ষা করে। এটা কেবিনের ভেতরের তাপমাত্রা ও বায়ুরচাপ পরিমাপ করে প্রকাশ করে। প্রতি সেকেণ্ডে এ সেন্সর যন্ত্রটি এসব তথ্য কন্ট্রোল সেন্টারে পাঠাতে থাকে।

প্রোবের ভেতরের কম্পিউটারগুলি প্রথমে এসব সংকেতকে বৈদ্যুতিক সংকেতে পরিণত করে এবং মহাকাশের ভেতর দিয়ে চারিদিকে পাঠায়। পৃথিবীতে এ সংকেতগুলি পেঁছানোর সাথে সাথে ট্রাকিং স্টেশনগুলি এ সংকেত গ্রহণ করে। ট্রাকিং স্টেশনের কম্পিউটারগুলি আবার এসব বৈদ্যুতিক সংকেতগুলিকে তাদের আসল রূপে পরিবর্তীত করে এবং কন্ট্রোল সেন্টারে পাঠায়। এ কাজগুলি সম্পন্ন হতে এক সেকেণ্ডের কয়েক হাজার ভাগের একভাগ সময় লাগে। প্রোবে যদি কোন গণ্ডগোল দেখা দেয় তবে কন্ট্রোল সেন্টারে সে খবর সাথে সাথে পেঁছে যায়। প্রোবের মধ্যে যারা থাকেন তাদের আগেই কন্ট্রোল সেন্টারের বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলিগণ প্রোবের ক্ষতি সম্পর্কে টের পান। এ ব্যবস্থাটি দুদিক দিয়েই কাজ করে। অর্থাৎ মিশন কন্ট্রোল থেকেও নানাবিধ সংকেতও প্রোবের কম্পিউটারে পাঠানো যায়। যেমন ধরা যাক প্রোবের একটি অংশ ঠিকভাবে কাজ করছে না। তখন একজন নিয়ন্ত্রক কম্পিউটারের মধ্যে একটি আদেশ দিবেন। এ কম্পিউটারটি আবার প্রোবের কম্পিউটারটিকে একটি মেসেজ পাঠাবে। আর সাথে সাথে ঐ অংশটি ঠিকভাবে কাজ করা শুরু করবে।

এই একই রকম একটি ব্যবস্থা আবার ক্রুদের শরীর সম্পর্কে ডাক্তারদের নানাবিধ খবর পাঠায়। প্রত্যেক নভোচারীর দেহের সাথে একটি করে সেন্সর যন্ত্র লাগানো থাকে। এ যন্ত্রটি নভোচারীর হৃদপিণ্ডের স্পন্দন আর শ্বাস প্রশ্বাস পরিমাপ করে। ডাক্তাররা একটি যন্ত্রে এসব পরিমাপ দেখতে পান। এসব তথ্য থেকেই তারা নভোচারীদের শরীরের অবস্থা সম্পর্কে বুঝতে পারেন। যদি কারো শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে যায় তবে তার শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত ওঠানামা করার কথা। তাই এসব তথ্য দেখেই ডাক্তাররা নানাবিধ নির্দেশ ক্রুদের দিয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

চাঁদের পথে দীর্ঘ যাত্রায় এসব যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব ভালোভাবেই কাজ করে। তিনদিন ধরে নভোচারীরা মহাকাশের ভেতর দিয়ে তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখেন। তারা তাদের অবস্থান ও কৌণিক দূরত্ব সব সময় ঠিক রাখেন। কৌণিক দূরত্বের হঠাৎ পরিবর্তন ঘটলে তারা ছোট রকেট চালু করে আবার তা ঠিক করে নেন। এ সময়ে যানটি খুব ভালভাবেই এগোতে থাকে এবং এতে কোনরূপ গোলমালও হয়নি।

ক্রু এবং নিয়ন্ত্রকগণ প্রায়ই রেডিওর মাধ্যমে কথা বলতেন। প্রতিদিন নভোচারীদের যাওয়ার সময় তাদের খবর পড়ে শোনানো হত। এ সব খবর শোনার প্রতি তাদের আগ্রহ একটু বেশি দেখা যায়। তাদের নিচে এ পৃথিবীতে কি কি ঘটছে তা জানতে তারা বেশ আগ্রহ ভরে বসে থাকতেন। ক্রুরাও তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নিয়ন্ত্রকদের বলতেন। দৃশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কলিন্স একদিন বলেন, "পৃথিবীটা খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে। কতগুলি দেশকে একেবারে স্পষ্ট দেখাচ্ছে। সুন্দর---------খুবই সুন্দর"। একজন কন্ট্রোলার উত্তরে বলেন, "তোমাদের জন্য আমার হিংসে হচ্ছে।" এরপরে একবার অলড্রিন মহাকাশযানে তার কাজের কথা জানান। তাকে বেশ খুশী মনে হয়নি। তিনি বলেন "আমি খুবই ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছি। সারা সকাল ধরে আমি রান্না করে তারপর পরিষ্কার করছি এবং এখনও আমার কাজ করা শেষ হয়নি।"

যাত্রার তৃতীয় দিনের দুপুরে ১৯শে জুলাই, এপোলো যানটি চাঁদে পৌঁছে। আবার তাদের স্পেসস্যুট পড়ে নিয়ে চাঁদের চারিদিকে কক্ষপথে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নেন। টেলিভিশন ক্যামেরা তাদের প্রত্যেকটি কাজকর্ম তোলে নিয়ে পৃথিবীতে পাঠাতে থাকে। টেলিভিশনের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ লোক তাদের এসব কাজকর্ম দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে থাকেন। প্রত্যেকটি নভোচারীই ছিলেন নীরব স্বভাবের মানুষ। সমূহবিপদ সামনে থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্যের বিষয় তাদের চিন্তামুক্ত দেখা যায়। তাদের স্ত্রীরা খুব সম্ভবতঃ তাদের থেকে এ সময় বেশি দুঃচিন্তায় ছিলেন।

খুব শীঘ্রই অ্যাপোলো যানটি চাঁদের পেছনে চলে যায় এবং সাথে সাথেই কন্ট্রোল সেন্টারের সাথে এর সব যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পৃথিবী থেকে দেখা না গেলে কোন যানের সাথে যোগাযোগ সম্ভবপর নয়। ক্রুরা বাধ্য হয়েছিলেন চাঁদের পেছন থেকে অ্যাপোলো যানকে কক্ষপথে নিতে। এ সময় মিশন

www.pathagar.com

কন্ট্রোলের বসে থাকা, আর সবকিছু যাতে ঠিকভাবে চলে তার জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোন কাজ ছিলনা। অ্যাপোলো যানটি খুবই জোড়ে চলছিল, ফলে নভোচারীদের এ গতিবেগ কমিয়ে এনে চাঁদের আকর্ষণ শক্তির সাথে একটি সামঞ্জস্যে আনতে হয়। একাজটি করার জন্য নভোযানটিকে নিজ অক্ষরের মধ্যে ঘোরাতে হয়। সার্ভিস মডিউলে তাদের একটি ইঞ্জিন চালু করতে হয়। আর ইঞ্জিনটি ছয় মিনিটের জন্য পোড়তে থাকে। এ ইঞ্জিনটি যদি চালু না হয় তবে যানটি আর কক্ষপথে যাবে না, এছাড়া এটা পৃথিবীর দিকেও ফিরে আসতে পারে। আর যদি ইঞ্জিনটি বেশিক্ষণ ধরে পোড়ে তবে প্রোবটি চাঁদের সাথে ধাক্কা খেয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

চাঁদের পেছনে ক্রুরা যখন এসব মারাত্মক ও জটিল কাজ করছিলেন। তখন মিশন কন্ট্রোলের লোকেরা দুঃশ্চিন্তায় সময় কাটাছিলেন। নিয়ন্ত্রকগণ এ সময় চিন্তিত মুখে বারবার ঘড়ির দিকে তাকাছিলেন। প্রতিটি মিনিট যেন মনে হয় এক এক ঘণ্টার মত। ২৫ মিনিট রেডিওর পাশে অপেক্ষা করার পর তাঁরা অলড্রিনের শান্তস্বর শুনতে পান। তিনি ঠিক দুটো কথা বলেন। "রাইট পারফেক্ট" এ সময় অ্যাপোলো এগারো নিরাপদে চাঁদের চারিদিকে এর পার্কিং অরবিটে অবস্থান নেয়। কন্ট্রোল সেন্টারের মানুষরা আবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

মুনশিপটি প্রায় ৫ লক্ষ কিলোমিটার পথ চলে মাত্র তিন মিনিট দেরী করে চাঁদে পৌঁছায়। পার্কিং অরবিটে যাওয়ার পর নভোচারীরা প্রথমবারের মত চাঁদের পৃষ্ঠ ভালভাবে দেখতে পান। আনন্দিত নভোচারীরা মহাকাশযানের কাচের জানালা দিয়ে চাঁদের রূপ দেখে তা মিশন কন্ট্রোলের নিকট বর্ণনা করেন। আর্মস্ট্রং চাঁদের পৃষ্ঠের রং সম্পর্কে বলেন যে তা নাকি ধূসর বর্ণের আচড়ে ভরা। এসময়ে আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন যেখানে অবতরণ করবেন তার উপর দিয়ে মহাকাশ-যানটি উড়ে যায়। তৎক্ষণাৎ আর্মস্ট্রং বললেন "নিচের এ জায়গাটি বড্ড অন্ধকারাচ্ছন্ন"। নভোচারিগণ টেলিভিশন ক্যামেরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পৃথিবীর মানুষদের চাঁদের পাহাড় পর্বত ও ফাট গুলি দেখান।

তাঁরা চাঁদের বর্ণনা দিতে দিতে একঘণ্টা সময় কাটিয়ে দেন। তাই মিশন কন্ট্রোল থেকে তাদের মনে করিয়ে দেয়া হয় যে অনেক কাজ করতে হবে। এর-পর কলিন্স কমাণ্ড মডিউলে রয়ে যান এবং আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন লুনার মডিউলে

www.pathagar.com

আরোহণ করে অবতরণের সবকিছু সম্পন্ন করেন। তার পরের দিন তাদের নামার দিন ছিল। আর্মস্ট্রং ছিলেন বড্ড শান্ত প্রকৃতির মানুষ। এত বড় একটা কাজ করতে যাচ্ছেন তার ব্যবহার দেখে তা মনেই হয়নি। তিনি খুব কম কথা বলেন। কিন্তু অলড্রিন খুবই আনন্দিত হয়ে পড়েন। ওজনহীন অবস্থায় অলড্রিন ভেসে ভেসে বোকার মত খেলতে থাকেন। তিনি একটি বোতাম টিপতে যান যা নাকি কন্ট্রোলারদের বিপদের সময় সংকেত শোনায়। কাজ করার সময় তিনি নানারকম মজা করতে থাকেন।

আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন সমস্ত যন্ত্রাংশ পরীক্ষা করে দেখেন। অবতরণের অংশের বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা তাও তারা পরীক্ষা করেন। একাজগুলি করতে তাদের দুঘণ্টারও বেশি সময় লাগে। এরপর আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন আবার কমাণ্ড মডিউলে কার্যরত কলিন্সের সাথে মিলিত হন।

এরপর কর্মক্লান্ত নভোচারী তিনজন তাদের খাবার সেড়ে নেন। খেয়ে দেয়ে তারা নিজস্ব কেবিনে গিয়ে ঘুম দেন—চাঁদে নামার পূর্বে তাদের শেষ ঘুম।

———

www.pathagar.com

৯

কল্পনার চাঁদে

আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন যেদিন সর্বপ্রথম চাঁদের মাটিতে পা রাখেন সেদিনটি ছিল উনিশ শ উনসত্তর সালের ২০শে জুলাই। নামার আগে এ দুজন কলিন্সের সাথে কিছু শুভেচ্ছা বাণী বিনিময় করেন। তারা বলেন আমরা যাচ্ছি এবং খুব শীঘ্রই ফিরে আসব তুমি কিন্তু আবার চলে যেওনা। কলিন্স হেসে তাদের শুভ কামনা করেন এবং বলেন আমি এখানেই থাকব। এরপর আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন বিজয়ের চিহ্ন (V) দেখিয়ে লুনার মডিউলে আরোহণ করেন।

এ সময় থেকে অবতরণের অংশটিকে "ঈগল" বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর যানের প্রধান অংশ অর্থাৎ কমাণ্ড ও সার্ভিস মডিউলের নাম দেয়া হয় "কলম্বিয়া"। মিশন কন্ট্রোল থেকে যোগাযোগের সময় তাঁরা কলিন্স এবং আর্মস্ট্রং ও অলড্রিনের সাথে এসব নামেই যোগাযোগ করেন। ঈগলে আরোহণ করে আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন এর সমস্ত যন্ত্রাংশ পরীক্ষা করে দেখেন। এবার তাঁরা একটি বোতাম টিপে এ যানের চারটি পা বের করে নেন। এ চার পায়ের উপরই ঈগল যানটির চাঁদের মাটিতে দাঁড়ানোর কথা। সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হয়ে গেল তারা ঈগলের কেবিনে গিয়ে অবতরণের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন। যানের ভেতর জায়গা এতই কম ছিল যে তাদের বসার জায়গাও ছিল না। তাই তারা একসাথে দাঁড়িয়ে বেল্ট দ্বারা কেবিনের সাথে তাদের আটকিয়ে নেন।

তারা প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথেই মিশন কন্ট্রোল হতে তাদের মূল যান থেকে ছুঁটিয়ে দেয়া হয় এবং তারা চাঁদের মাটিতে অবতরণ করতে থাকেন। এর তিন মিনিট পর অ্যাপোলো যানটি আবার চাঁদের পেছনে চলে যায় এবং এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থাও বন্ধ হয়ে যায়। এসময়ে নভোচারীদের এ মারাত্মক কাজে অংশ নিতে হয়। আর নিয়ন্ত্রকগণ চুপচাপ দুঃচিন্তার মধ্যে সময় অতিবাহিত করেন। অবশেষে মুনশিপ থেকে আর্মস্ট্রং-এর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, "ঈগলের সত্যিই পাখা আছে"। তাঁরা নিরাপদেই মূলযান থেকে লুনার মডিউটিকে ছুটিয়ে চাঁদের পথে রওনা হয়ে যান।

www.pathagar.com

ঈগলযানটি দুটি পর্যায়ে চাঁদে অবতরণ করে। যখন লুনার মিটার এগিয়ে যায় তখন তারা একটি ইঞ্জিন চালু করেন। এটা আরোও নিচুতর কক্ষপথের দিকে ঈগলকে ছুঁড়ে দেয়। ফলে এটা আস্তে আস্তে অবতরণ করতে থাকে। এপর্যায়ে গুরুতর কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না।

কারণ যেহেতু এটা একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে থাকে তাই এটা চাঁদের সাথে ধাক্কা লেগে ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। আর যদি কোন বিপদ ঘটেই তবে কলম্বিয়াও নিচুতর কক্ষপথে নেমে তাদের বাঁচাতে পারবে। ঈগল যানটি চাঁদের ১৬,৫০০ মিটার উপরে থাকতেই প্রথম ধাপের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এখন নভোচারীদের একটি মস্ত বড় সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রশ্ন হল, কক্ষ-পথ ছেড়ে অবতরণ করা কি নিরাপদ হবে কিনা? এ সময় যদি তারা অবতরণ কার্য চালিয়ে যায় তারা চাঁদের পৃষ্ঠে না নামা পর্যন্ত আর ফিরে আসতে পারবে না। এটাই তাদের শেষ সুযোগ এ সময় তাদের কোন অসুবিধা থাকলে তারা অবতরণ না করে আবার ফিরে আসতে পারেন। অবতরণের সময় নানারকম বৃহৎ বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন কোন চিন্তা না করে তাদের যানের অবতরণের ইঞ্জিনটা চালু করে দেন। ফলে তাদের যানটি ক্রমাগত চাঁদের পৃষ্ঠের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

এরপর ঈগলের গতিবেগ আস্তে আস্তে কমতে থাকে। আর এর ফলে চাঁদের অভিকর্ষ শক্তির সাথে এর সামঞ্জস্যও নষ্ট হয়ে যায়। এর পরই মডিউলটি চাঁদে অবতরণের জন্য আস্তে আস্তে নামতে থাকে। ঈগলের নামার পথটি ছিল অনেকটা বাঁকানো। অবতরণের শেষ পর্যায়টি শেষ হতে প্রায় ১২ মিনিট সময় লাগে। এ সময়ের মধ্যে যেকোন রকম মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারে। নভো-যানটি কিভাবে অবতরণ করল সেটা টেলিভিশনে দেখানো সম্ভবপর হয়নি। কারণ কোন ক্যামেরা মহাশূন্যে থেকে যানটির ছবি নেয়নি। তবে অবতরণের শেষ পর্যায়ের মিনিটের ঘরগুলি টিভিতে দেখা যায় এবং দর্শকরা নিয়ন্ত্রক এবং নভোচারীদের কথাবার্তাও শুনতে পান। অবতরণের শেষ পর্যায়গুলোতে বিশেষ করে নিয়ন্ত্রকদের বেশ বিচলিত দেখা যায়। সবার মনে তখন একটাই প্রশ্ন নভোচারীরা কি নিরাপদে চাঁদে অবতরণ করবে?

অবতরণের আগে আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন তাদের ছোট কেবিনে ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের যন্ত্রাংশগুলি পরীক্ষা করতে থাকেন। কন্ট্রোল

www.pathagar.com

টাওয়ার থেকে তাদের নানারকম খবর এবং যান্ত্রিক অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়। তারা তদানুযায়ী কাজ করতে থাকেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় নিয়ন্ত্রক এবং নভোচারী কারোর মধ্যেই এ সময় কোনরূপ উত্তেজনা দেখা যায়নি।

হঠাৎ ঈগলযানটির মধ্যে একটি বিপদ সংকেত বেজে ওঠে তৎক্ষণাৎ আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন সমস্ত যন্ত্রাদি পরীক্ষা করেন। সবকিছুই ঠিকভাবেই কাজ করছিল। এরপর আরো তিন চারবার এ বিপদ সংকেত জ্বলে ওঠে। কিন্তু এর সবগুলোই ছিল ভুল সংকেত। ফলে কোন বিপদ ঘটেনি।

ঈগলটি আস্তে আস্তে চাঁদের পৃষ্ঠের খুব নিকটে আসতে থাকে। ১৫০০০ মিটার উপরে থাকতে মিশন কন্ট্রোল থেকে বলা হয় তোমরা বেশ ভালোভাবেই নামছ। ১০০০০------৬০০০ মিটার-----৪০০০ মিটার হয়ে চাঁদের ২০০০ মিটার উপরে থাকতে মিশন কন্ট্রোল থেকে বলা হয় তোমরা চাঁদের পৃষ্ঠ নামতে যাচ্ছ। কম্পিউটার সম্পূর্ণভাবে ঈগলের অবতরণ কার্য চালায়। ফলে আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন জানালা থেকে চাঁদের পৃষ্ঠ আর দেখতে পাননি। ঈগলটি যখন ঠিক এটার অবতরণ স্থানের ওপরে ছিল তখনই তারা চাঁদের পৃষ্ঠ দেখতে পান। দেখার সাথে সাথেই তারা চমকিয়ে ওঠেন। কারণ তারা যেখানে অবতরণ করতে চাচ্ছিলেন সেটা ছিল পাথর আবৃত একটি বৃহৎ গর্ত (এগুলিকে সাধারণতঃ ক্রেটার বলা হয়)। আর্মস্ট্রং সাথে সাথেই ঈগলের নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নিয়ে নেন। বেশ অভিজ্ঞতার সাথে তিনি পাথুরে গর্ত থেকে ঈগলযানটিকে বাঁচিয়ে আনেন। যার ফলে মারাত্মক দুর্ঘটনা থেকে তাঁরা রেহাই পান। আমস্ট্রং এবং অলড্রিন অবতরণ স্থান থেকে সাত কিলোমিটার দূরে একটি সমতল জায়গা খুজে পান এবং সেখানে অবতরণ করার মনস্থ করেন। তারা ঈগলের গতিবেগ কমিয়ে প্রায় এক মিটার/সেকেণ্ডে নিয়ে আসেন। ফলে ঈগলটি আস্তে আস্তে পৃষ্ঠের দিকে নামতে থাকে। এ সময় নভোচারীদের জন্য একটি চিন্তাকর সময়। কারণ অবতরণটি অবশ্যই আস্তে হতে হবে এবং কৌণিক দূরত্ব অবশ্যই সঠিক হতে হবে। ভুল কোণে যদি ঈগলটি অবতরণ করে তাহলে তার একটি পা ভেঙ্গে যেতে পারে। আর যদি পা ভেঙ্গেই যায় তবে নভোচারীরা চাঁদ থেকে আর উড্ডয়ন করতে পারবে না। সেখানে তাদের উদ্ধার করার জন্যও কেউ যেতে পারবে না। কারণ পৃথিবী থেকে কাউকে পাঠাতে যত সময় লাগবে ততক্ষণে তাদের অক্সিজেন ফুরিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

কিন্তু কোনরকম অসুবিধা সেখানে হয়নি। পঁচাত্তর ফুট--ষাট ফুট--পঞ্চাশ ফুট..... চল্লিশ ফুট ত্রিশ--বিশ--এভাবে ক্রমে ক্রমে তারা চাঁদের পৃষ্ঠে অতি নিরাপদে অবতরণ করতে থাকেন।

অবশেষে চাঁদের পৃষ্ঠের সাথে ঈগলযানের পা গিয়ে ঠেকল। তখনই কেবিনের ভেতর একটি আলো জ্বলে উঠে। এর অর্থ হল যানটি অবতরণ করেছে। আলোটি ছিল নিল রংয়ের। তৎক্ষণাত আর্মস্ট্রং আনন্দিত ভাবে বলে উঠেন "হিউস্টন, ঈগলযানটি অবতরণ করছে।" একথা শুনে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ বৃহৎ একটি আশংকা মুক্ত হন। কারণ তারা এর জন্য নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছিলেন নভোচারী এবং নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে কথোপকথন শুনছিলেন। আর নভোচারীদের স্ত্রীরা যে কিরকম শংকা মুক্ত হন তা তো বোঝাই যায়। অলড্রিনের স্ত্রী, জোয়ান, এতই খুশী হন যে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

অবতরণের পর আবার আর্মস্ট্রং ও অলড্রিনের দেখতে হয় চাঁদে থাকা তাদের জন্য নিরাপদ কিনা? ঈগলের কোন ক্ষতি হল কিনা? এর নানারকম যন্ত্রাংশ ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা? ঈগলযানটি কি ঠিক কৌণিক দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে? এ সময় যদি তাদের কোন অসুবিধা দেখা দেয় তাহলে তাদের তৎক্ষণাত উড্ডয়ন করার কথা। কিন্তু তারা সবকিছু পরীক্ষা করে দেখে বুঝলেন যে পরিস্থিতি তাদের অনুকূলেই আছে। ফলে মিশন কন্ট্রোল থেকে তাদের থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিনের এ সফল অবতরণের জন্য মিশন কন্ট্রোল থেকে তাদের সাদর অভিনন্দন জানানো হয়। কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে তাদের বলা হয় এ ঘরটিতে অনেক হাসি মাখা মুখ বসে আছে। চাঁদ থেকে তারা দুজনও জবাব দেন এখানেও দুজন আছেন।

তখনই কলম্বিয়া থেকে কলিন্স বলে উঠেন কমাণ্ড মডিউলের একজনের কথাও ভুলনা। তিনি কমাণ্ড মডিউলে বসে বসে তাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। তার ওপর দায়িত্ব পড়েছিল কলম্বিয়া যানটিকে ঠিকমত পরিচালনা করা। তিনি আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিনের অবতরণের ফলে খুব খুশী হন এবং তাদের সাদর অভিনন্দন জানান।

এটা সত্যিই একটি আশ্চার্যজনক বিষয়। অক্লান্ত পরিশ্রম এবং তাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন অবতরণের সময় ঈগলকে যে মারাত্মক দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন সেখানেই তাদের যাত্রার সমাপ্তি হতে পারত। এত

www.pathagar.com

বিপদ সত্ত্বেও তারা ঠিকভাবে, ঠিক কৌণিক দূরত্বে, নির্দিষ্ট সময়ের একমিনিট পূর্বে অবতরণ করেন।

সারা পৃথিবী তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। চাঁদে যাওয়া মানুষের এতদিনের কল্পনা সত্যি হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের লোকেরা খুবই আনন্দিত হয় এবং রাশিয়াসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আমেরিকানদের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন লিপি পাঠানো হয়। অবশ্য এ বিজয়ের ফলে সব লোক খুশী হয়নি। তারা ভাবতে থাকে, মানুষ এর পরে কি করবে? একজন লোকতো খুবই ভীত হয়ে পড়েন। তিনি চিৎকার করে বলে উঠেন "হায় প্রভু। এটাই পৃথিবীর শেষ" এবং তৎক্ষণাত মারা যান।

এরই মধ্যে নেইল আর্মস্ট্রং এবং মাইকেল কলিন্স তাদের পরবর্তী বৃহৎ কাজ চাঁদের পৃষ্ঠে হাটার জন্য প্রস্তুতি নেন। তারা কাচের তৈরি জানালা দিয়ে চারিদিকের দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করেন। তারপরেই অলড্রিনের বার্তা প্রেরণ শুরু হয়ে যায়। তিনি কন্ট্রোল সেন্টারকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন "এ জায়গাটিতে নানারকমের ছোট বড় পাথর আছে। আপনারা এ জানালার ধারে বসেই নানারকমের এসব পাথর পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন"। এছাড়া তাদের অবতরণ স্থানে অনেক ছোট বড় গর্তও চোখে পড়ে। তবে এগুলরি বেশির ভাগই একমিটার বা তার চেয়ে কম পরিধিবিশিষ্ট।

নভোচারিগণ মানচিত্র দেখে চাঁদের ওপর তাদের অবস্থান চিহ্নিত করে নেন এবং নিয়ন্ত্রকদের সাথে তাদের পরবর্তী কার্যাদি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন। মিশন কন্ট্রোলের সবাই আশা করেছিলেন যে নভোচারীরা হয়তো এত কাজ করার পর নিশ্চই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই চাঁদ পৃষ্ঠে পদচারণার আগে হয়তো তাদের বিশ্রাম নেয়ার প্রয়োজন হবে। কিন্তু আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিনের মধ্যে ক্লান্তির কোন ছাপতো পড়েই নি বরং তারা চাঁদে নামার জন্য মিশন কন্ট্রোল থেকে আগেভাগে অনুমতির জন্য আবেদন করতে থাকেন। মিশন কন্ট্রোল আবেদন মেনেনেন।

আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন তাদের খাওয়া দাওয়া সেড়ে নেন। এটাই পৃথিবীর মানুষের চাঁদের পৃষ্ঠে প্রথম খাওয়া। এরপর তারা বিকিরণ ও তাপ থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য বিশেষভাবে তৈরি জামা পড়ে নেন। এছাড়া অক্সিজেন ও

www.pathagar.com

নানারকম যন্ত্রপাতি তারা পিঠের সাথে বেঁধে প্রস্তুত হয়ে নেন চাঁদে নামার জন্য। অবতরণের প্রায় সোয়া ছয়ঘণ্টা পর তারা ঈগলের দরজা খুলে চাঁদের বুকে উন্মুক্ত দৃষ্টি ফেলেন।

দৃশ্যটি ছিল সত্যিই অভাবনীয়। সারা আকাশ অন্ধকারের মত কালো, কিন্তু চাঁদটি ছিল সূর্যের আলোতে ঝলমল। চাঁদটি হল ধূলার মরুভূমি। আর এতে রয়েছে ছোট বড় অসংখ্য ফাটল। এখানে নেই কোন প্রাণের চিহ্ন সে সময় চাঁদের বুকে জীবিত প্রাণী বলতে শুধু আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন। এ সময় আর্মস্ট্রং প্রথম কথা ছিল "THE MOON LOOKS FRIENDLY TO ME"।

তিনি স্পেসস্যুট পড়ে ঈগলের দরজা দিয়ে কোন মতে বেরিয়ে এসে মই দিয়ে নামার জন্য প্রস্তুত হন। এ সময় তিনি টেলিভিশন ক্যামেরাটি চালু করে দেন ফলে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ এরকম একটি ঘটনা টিভির মাধ্যমে দেখতে পান। মই বেয়ে নামা কিন্তু ছিল খুবই কষ্টকর ব্যাপার। বায়ুহীন অবস্থায় আর্মস্ট্রং-এর পা এবং হাতের অনুভূতি ছিল না বললেই চলে। এছাড়া পা কতখানি নামাতে হবে এবং ঠিকমত পা পড়ল কিনা তাও বোঝা যাচ্ছিল না। অলড্রিন এসময়ে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে তারা নামা লক্ষ্য করে তাকে অবতরণ কার্যে সাহায্য করেন। অতীব কষ্টে এবং দক্ষতার সাথে অবশেষে মিনিট বিশেক পর অবশেষে আর্মস্ট্রং মই-এর একেবারে তলদেশে পৌঁছতে সক্ষম হন। অবশেষে চাঁদের বুকে এসে নামেন—চাঁদের বুকে মানুষের প্রথম পদচিহ্ন। তিনি বলেন, "THAT'S ONE SMALL STEP FOR MAN ONE GIANT LEAP FOR MANKIND"।

মাটিতে নেমেই আর্মস্ট্রং ওখানকার মাটি নিরাপদ কিনা তা পরীক্ষা করেন। তিনি জোড়েসোড়ে মাটিতে তার একটি পা রাখেন এবং দেখেন তার পদচিহ্নের গভীরতা মাত্র এক সেন্টিমিটারেরও কয়েক ভাগের একভাগ। এরপর অলড্রিন নিচে নেমে তার সহচারীর সাথে মিলিত হন। তিনি তার নৈমত্তিক আনন্দ চিত্তেই ছিলেন। তিনি মই থেকে একলাফে মাটিতে নেমে পড়েন এবং আবার লাফ দিয়ে মই-এ চড়ে বসেন। তিনি আনন্দে উল্লাসিত হয়ে চিৎকার করে ওঠেন।

নামার পর তারা দুজন চাঁদের মাটিতে হাটার চেষ্টা করেন। প্রথম দিকে তাদের হাটার চেষ্টা দেখা ছিল মজার ব্যাপার। তারা প্রায় ওজনহীন অবস্থায় থাকার ফলে তাদের নিজস্ব কোন অনুভূতি ছিল না। তারা জানতেন না তাদের পা তাদের ঠিক কতকখানি এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাদের চলাফেরা দেখে মনে

www.pathagar.com

হয়েছিল তারা যেন মাতাল হয়ে পড়েছেন। তবে সিমিউলেটরে তাদের ট্রেনিং-এর ফলে এসব সমস্যা তারা খুব সহজে এবং তাড়াতাড়ি কাটিয়ে ওঠেন এবং ভেসে ভেসে চলাচল শুরু করেন।

তারা কিছু ছোট বড় পাথর নিয়ে মাটির দিকে ছুঁড়ে মারেন। এগুলি ঠিক খেলার বলের মত লাফাতে লাফাতে চলতে থাকে। এতে তারা খুবই আনন্দিত হয়ে হাসতে থাকেন। আর্মস্ট্রং বাচচাদের মত বলে ওঠেন, "কি মজার খেলা?" নভোচারিগণ চাঁদের উপর একটি টেলিভিশন ক্যামেরা স্থাপন করেন। তারা ঈগলের পায়ের সাথে বাঁধা একটি প্লাকের উপর জড়ানো ইস্পাতের পাতটি সরিয়ে ফেলেন। সেখানে লেখা ছিল "HERE MEN FROM THE PLANET EARTH FIRST SET FOOT UPON THE MOON JULY 1969 A. D. WE CAME IN PEACE FOR ALL MANKIND।"

প্লাকের পাশেই তাঁরা আমেরিকার একটি পতাকা স্থাপন করেন। পতাকাটি সবসময়ই যাতে খোলাভাবে থাকতে পারে সেজন্য এটাকে একটি শক্ত ধরনের ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয়। চাঁদে যেহেতু কোন বাতাস নেই সেজন্য এব্যবস্থা। পতাকাটি স্থাপন হওয়ার সাথে সাথেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিকসন টেলিফোন-যোগে নভোচারীদের সাথে কথা বলেন। তাদের এ বৃহৎ কাজের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ তিনি বলেন "আপনারা যা করেছেন তার জন্য স্বর্গও মানুষের পৃথিবীর একটি অংশ হয়ে গেল" তিনি তাদের শুভ প্রত্যাগমন কামনা করেন এবং আনন্দ-সহকারে বলেন, "বৃহস্পতিবারে দেখা হবে"।

কমাণ্ডার আর্মস্ট্রং এতে প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, "এখানে আসাটা আমাদের জন্য খুবই সম্মানের ব্যাপার"। এরপর দুজন নভোচারী ঈগল থেকে নানারূপ বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি এনে তিনটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। তারা একটি SCISMOMETER এবং একটি লেসার রিফেলেক্টর স্থাপন করেন। এ সিসমোমিটারটি চাঁদের ভূতাত্ত্বিক অসুবিধা হলে তা গ্রহণ করে রেডিওর মাধ্যমে প্রকাশ করে। এরকম কিছু ধরা পড়লে চাঁদটি কি দ্বারা তৈরি তা বিজ্ঞানীদের জানতে সুবিধা হবে। লেসার রিফ্লেকটরটি চাঁদ থেকে আলোক রশ্মি পৃথিবীর দিকে পাঠাবে। এ আলোক রশ্মি পাঠ করে বিজ্ঞানীরা পৃথিবী ও চাঁদের দূরত্বের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হলেও তা বের করতে পারবেন। এদুটি যন্ত্র এখন চাঁদে রয়েছে এবং মূল্যবান অনেক তথ্যাদি এখনও

www.pathagar.com

এগুলি সরবরাহ করছে। এছাড়া তারা চাঁদের বুকে সূর্য থেকে আসা গ্যাস আটকানোর জন্য একটি অ্যালুমিনিয়ামের পাতও স্থাপন করেন।

তারা এ জিনিসটিকে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন যাতে করে বিজ্ঞানিগণ গ্যাসটি পরীক্ষা করতে পারেন। পরীক্ষার ফলটি হয়তো সূর্য ও গ্রহগুলি কিভাবে তৈরি হয়েছে তা বলে দিতে পারবে।

এছাড়া আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন বিজ্ঞানীদের প্রয়োজনীয় আরো কিছু কাজ করেন। তারা বিজ্ঞানীদের জন্য চাঁদের ধূলামাটি এবং পাথর সংগ্রহ করেন। এসব জিনিস হয়তো চাঁদের বয়স সম্পর্কে মানুষকে একটি সঠিক ধারণা দেবে। নভোচারিগণ ভেসে ভেসে নানা জায়গায় গিয়ে নানারকম পাথর নিয়ে তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাদের কাছে লম্বা লম্বা লাঠি ছিল। যার ফলে কুজো না হয়েই পাথরগুলি সংগ্রহ করতে পারতেন। তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে পাথর সংগ্রহ করা ছাড়াও ভূপৃষ্ঠের নিচে থেকেও পাথর সংগ্রহ করেন। তারা প্রত্যেকটি নমুনার ছবি গ্রহণ করে আলাদা আলাদা থলেতে ভরে রাখেন। অতঃপর এগুলিকে একটি অ্যালুমিনিয়ামের বাক্সে করে নিয়ে ঈগলে যান।

এভাবে চাঁদের বুকে তাদের কাজের অবসান ঘটে। তারা অ্যালুমিনিয়ামের পাতগুলিকে সংগ্রহ করে একটি বাক্সে নিয়ে নেন। অবশেষে বেশ ব্যাথিত হৃদয় নিয়ে চাঁদের চারিদিকে একবার ভাল করে দেখে নেন। তারা ভাবেন "আমরা আর কখনও এখানে আসতে পারব না" তারপর তাঁরা ঈগলে উঠে দরজা বন্ধ করে দেন। মিশন কন্ট্রোল থেকে চাঁদের বুকে তাদের কাজ করার জন্য খুব তারিফ করা হয়। আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন দু ঘণ্টা একত্রিশ মিনিটের মত চাঁদে হাটাহাটি করে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাই তারা কিছু আহার করে কয়েক ঘণ্টার জন্য ঘুমিয়ে নেন। ঈগলে তাদের জন্য কোন বিছানা ছিল না। আর্মস্ট্রং ঈগলের ইঞ্জিনের কভারে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। অলড্রিন একে বেকে ঈগলের সেই ছোট মেঝেতেই শুয়ে থাকেন।

এদুজন নভোচারী চাঁদের বুকে ২১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট থাকেন এ সময়ে মাইকেল কলিন্স কলম্বিয়াতে করে ১১০ কিলোমিটার উপর হতে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। তিনিই ছিলেন গ্যাগারিনের পরে মহাকাশের সবচেয়ে একাকি মানুষ।

সব কাজ হয়ে যাওয়ার পর অলড্রিন এবং আর্মস্ট্রং চাঁদের বুক ছেড়ে কলম্বিয়ার দিকে যাত্রা করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। অবতরণের মত উড্ডয়নও

www.pathagar.com

একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। বরঞ্চ এক্ষেত্রে আরও বেশি বিপদজনক বলাটাই ঠিক হবে। কারণ ঈগলটিকে উড্ডয়নের জন্য মাত্র একটা রকেট ইঞ্জিন ছিল। এ রকেট ইঞ্জিনের কাজ হল ঈগলটিকে চাঁদের বুক থেকে ২০০০০ মিটার উচ্চতায় উঠিয়ে কক্ষপথে ছুঁড়ে দেয়া। এবস্থায় যদি ইঞ্জিনটি কাজ না করে তাহলে আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন চাঁদের বুকে থেকে মৃত্যুর দিন গোনা ছাড়া কোন কিছুই করার থাকবে না। কারণ তাদের উদ্ধার করাও সম্ভব হবে না অক্সিজেনের সীমিত স্টকের জন্য। ফলে অক্সিজেনের অভাবেই তারা মৃত্যুবরণ করবে।

মিশন কন্ট্রোল থেকে উড্ডয়নের আদেশ দেয়া হয়। এসময়ে তারা চিন্তায় ঘামতে থাকেন। অবশেষে অলড্রিন গুণতে শুরু করেন TEN .....ONE ..... তৎক্ষণাৎ আর্মস্ট্রং একটি বোতাম টিপে দেন এবং ইঞ্জিনটা চালু হয়ে যায়। সাথে সাথে ঈগলযানটি ওপরে উঠতে থাকে। এটার পা এবং নিচের অন্যান্য অংশ চাঁদের বুকেই রয়ে যায় এবং ওপরের ছোট্ট কেবিনটি ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে থাকে। অবশেষে ঈগলযানটি নিরাপদে তার কক্ষপথে অবস্থান নেয়। ঈগল-যান-এর কক্ষপথে এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। আর্মস্ট্রং মিশন কন্ট্রোলকে জানিয়ে দেন। একথা শোনার পর নিয়ন্ত্রকদের ঘাম ঝেড়ে ফেলার সুযোগ হয়। ফ্লাইট ডিরেক্টর বলেই উঠেন, "ঈগল সারা বিশ্ব তোমার জন্য গর্বিত"।

পার্কিং অরবিটে ঈগল যানটি কলম্বিয়া যানের সাথে মিলিত হয়। কিছু সময় কষ্ট করার পর দুটি যানকে নভোচারিগণ একত্রিত করতে পারেন। অর্থাৎ ঈগল ও কলম্বিয়া মিলে আর অ্যাপোলো এগারো যানটি তৈরি হয়। অবশেষে আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন হামাগুড়ি দিয়ে কমাণ্ড মডিউলে একা বন্ধু মাইকেল কলিন্সের সাথে মিলিত হন। নভোচারিগণ এভাবে তাদের মিশন শেষ করেন। অর্থাৎ তারা যেকোন সময়েই পৃথিবীর পথে রওনা হতে পারেন।

HEAT SEALED : ঘর্ষজনিত তাপ হতে রক্ষা করার জন্য মহাকাশ-যানে যে পাতটি ব্যবহার করা হয়।

---

www.pathagar.com

১০

পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন

২২শে জুলাই নভোচারিগণ চাঁদ থেকে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে তাদের লম্বা যাত্রার শুরু করেন। লুনার মডিউলের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে তারা এটাকে মূলযান থেকে ছুঁটিয়ে মহাকাশে ফেলে আসেন। আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন এ ছোট্ট কেবিনটিকে মহাকাশে ফেলে আসতে বেশ কষ্ট পেয়েছিলেন। তাদের ইচ্ছা ছিল এটাকে সাথে করে নিয়ে আসা। কিন্তু এটাতো আর সম্ভব নয়। নভোচারিগণ লুনার মডিউলটিকে বিদায় জানিয়ে কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে আসার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এটা আবার একটা চিন্তাকর সময়। কারণ প্রোবের ইঞ্জিন যদি এতে ঠিকমত কাজ না করে তবে তারা আর কক্ষপথ থেকে যাত্রা করতে পারবেন না। কিন্তু ইঞ্জিনটি ঠিকমত কাজ করে। এটা চাঁদের যানটিকে কক্ষপথ থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় এবং একটি বাঁকানো পথে পৃথিবীর দিকে ছুঁটতে থাকে।

পৃথিবীর দিকে নভোচারীদের যাত্রাটা বেশ শুভ ছিল। কারণ তাদের মাত্র একবার কৌণিক দূরত্ব ঠিক করা ছাড়া আর কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। তাদের এ যাত্রা ষাট ঘণ্টা স্থায়ী হয়। যখন অ্যাপোলো যানটি পৃথিবীর প্রায় কাছাকাছি চলে আসে তখন নভোচারিগণ সার্ভিস মডিউলটিকে মূলযান হতে ছুটিয়ে দেন। তারপর তারা কমাণ্ড মডিউলটিকে মূলযান হতে ছুটিয়ে দেন। তারা কমাণ্ড মডিউলটিকে ঘুরিয়ে দেন যাতে রক্ষাকারী HEAT SHIELD-টি পৃথিবীর দিকে তাক করা থাকে। এ সময় প্রোবটি ঘণ্টায় চল্লিশ হাজার কিলোমিটার বেগে ভ্রমণ করছিল। নভোচারিগণ এটার কৌণিক দূরত্ব ঠিক করে গতিবেগ কমিয়ে দিয়ে খুব সতর্কতার সাথে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করান। কারণ এটাই হল এ যাত্রার সবচেয়ে মারাত্মক কাজ। আর সাথে সাথেই পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণকক্ষের সাথে অ্যাপোলোর নভোচারীদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর এ সময় তো বোঝাই যায় কন্ট্রোল টাওয়ারে লোকজন তথা সারা পৃথিবীর মানুষ কিরকম ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সবার মনেই তখন

www.pathagar.com

একই চিন্তা নভোচারিগণ কি বেঁচে আছেন? বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে কি প্রোবটা পুড়েই গেল? ইত্যাদি।

এসব প্রশ্ন নিয়ে মানুষের মাত্র সাড়ে তিনমিনিট অপেক্ষা করতে হয়। তারপরই দূর আকাশে একটি লাল আলোর আবির্ভাব ঘটে আর এটাই হল অ্যাপোলো। তার কিছুক্ষণ পরই প্রোব থেকে একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে "আমরা খুব সুন্দরভাবে নিচে নেমে আসছি"। অবতরণের শেষ পর্যায়ে প্যারাসূটগুলি খুলে প্রোবের গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৫ কিলোমিটারে নামিয়ে নিয়ে আসে। তারপর এটা খুবই ধীরে ধীরে অবতরণ করতে থাকে এবং সমুদ্রের পানিতে অবতরণ করে। এটার নাকটা পানির দিকে রেখে অবতরণ করলেও সাথে সাথে পরিবর্তন করে ঠিক অবস্থানে ফিরে আসে। অ্যাপোলো যানটি আমেরিকা থেকে উড্ডয়ন করার পর থেকে প্রায় এক মিলিয়ন কিলোমিটার ভ্রমণ করে। কিন্তু তবুও মাত্র দশ সেকেণ্ড দেরী করে এটা পৃথিবীতে ফিরে আসে।

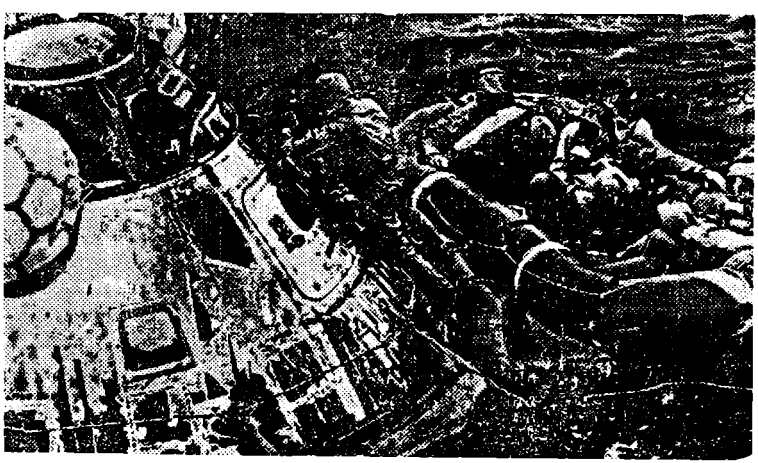

সমুদ্রে পতিত হওয়ার পর মডিউলটির চারপাশে 'ফ্রগমেন'রা কলার জুরে দিচ্ছে।

এ সময় অবতরণের স্থানের ২০ কিলোমিটার দূরেই হর্নেট নামে একটি বিমান-বাহী জাহাজ অপেক্ষা করছিল। এ জাহাজ থেকে দুটি হেলিকপ্টার এসে সাগরে ফ্রগমেন নামায়। ফ্রগমেনরা হলেন সাগরের মধ্যে উদ্ধারকার্য চালানোর মানুষ। এ সকল সাতারুরা মহাকাশযানটির দিকে সাতরিয়ে গিয়ে এটার চারদিকে একটি

www.pathagar.com

কলার জুড়ে দেয়। যাতে যানটি সাগরে ভেসে থাকতে পারে। তারপর তাদের মধ্যে একজন ক্যাপসূলের দরজা খুলে তাদের GERMPROOF স্যুট পরতে দেন। এগুলো নভোচারীদের পড়া দরকার একারণে যে তারা হয়তো চাঁদ থেকে অজানা জীবাণুও বহন করে আসতে পারেন। নভোচারীরা তাদের কাপড় বদলিয়ে ক্যাপসূল থেকে বাইরে এসে রাবারের নৌকায় অপেক্ষা করতে থাকেন। একটি হেলিকপ্টার এসে পরে তাদের নিয়ে গিয়ে জাহাজে তোলে।

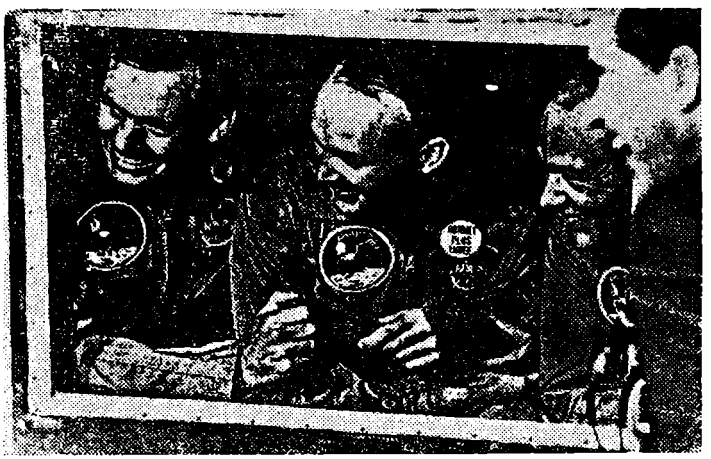

হাস্যরত তিন নভোচারীকে প্রেসিডেন্ট নিক্সন অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

আর্মস্ট্রং, অলড্রিন এবং কলিন্স যখন হর্নেটে পৌঁছেন। তখন সবাই তাদের সমস্বরে অভিনন্দন জানান এবং একটি ব্যাণ্ড বাজানো হয়। তারা এতে প্রচণ্ড খুশী হয়ে এক সাথে কয়েক সিড়ি করে নামতে থাকেন। কিন্তু ডাক্তাররা তখনই তাদের GERMPROOF ঘরে নিয়ে তালাবদ্ধ করেন। ঘরের কাচের জানালা দিয়ে হাস্যরত নভোচারিগণ আনন্দে দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়াতে থাকেন। জাহাজের সবাই তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

স্বয়ং প্রেসিডেন্ট নিকসন নভোচারীদের স্বাগতম জানানোর জন্য হর্নেট জাহাজে এসে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি নভোচারীদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন উত্তরে নভোচারীরা বলেন "আমরা এতভাল আছি যে এমন ভাল আমরা কোনদিনই ছিলাম না"।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট হেসে তাদের নানাভাবে নিজের অভিনন্দন জানান। তারপর হঠাৎ তিনি বেশ গম্ভীরভাবে বলে উঠেন, "আপনারা জানেন, এটাছিল মাত্র ৮ দিন। একটি সপ্তাহ—দীর্ঘ সপ্তাহ। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এটা একটি বিরল এবং বিখ্যাত সপ্তাহ"। নভোচারিগণের নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের জন্য আমেরিকা-সহ এর আশেপাশের সকল দেশের নাগরিকগণ বেশ আনন্দবোধ করেন। তবে এটা স্বাভাবিক যে সবচেয়ে সুখী তিনজনই ছিলেন। তারা হলেন তিন নভোচারীর স্ত্রীরা। এবৃহৎ যাত্রার প্রতিটি বিপদজনক মূহুর্তের ছাপই তাদের চেহারায় প্রতিফলিত হয়েছে।

নভোচারিগণ তাদের যাত্রা শেষ করার পরও তাদের সাথে সাথে ছেড়ে দেয়া হয়নি। যখন জাহাজটি দুইস্টোন পৌঁছে তখন তাদের সেখানে একটি জীবাণু মুক্ত ঘরে প্রায় দুসপ্তাহ রাখা হয়। তারপর তারা তাদের পরিবারে প্রত্যাবর্তন করেন। এর পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে তারা আমেরিকার নানা ছোট বড় শহরগুলোতে গিয়ে লোক সমাবেশে তাদের অভিযানের কথা বলেন। এরপর তারা ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যান এবং লোকজনের সাথে মিলিত হন। সব জায়গাতেই নভোচারিগণ বৃহৎ বৃহৎ জনসমাবেশ দ্বারা স্বাগত হন।

ইতিমধ্যেই যেসব পাথর ও বালি নভোচারিগণ পৃথিবীতে বয়ে এনেছিলেন সেগুলো পৃথিবীর নানা দেশে পাঠানো হয়। বিজ্ঞানীদের গবেষণা কার্য চালানোর জন্য। কারণ এগুলো থেকে হয়তো বিজ্ঞানীরা জানতে পারবেন চাঁদের বয়স কত? এটা কিভাবে হল? এটা কি কি পদার্থ দ্বারা তৈরি? মানুষের চাঁদে এই প্রথম অবতরণ মহাকাশ যুদ্ধে মানুষের এক চরম বিজয়।

---

www.pathagar.com

১১

চাঁদে আরো অভিযান

১৯৬৯ সনের নবেম্বর মাসে আমেরিকার নভোচারিগণ অ্যাপোলো ১২-তে করে চাঁদের উদ্দেশ্যে আরো একটি অভিযান পরিচালনা করেন। এ অভিযানের নভোচারীরা ছিলেন চার্লস কনরেড, রিচার্ড গর্ডন ও অ্যালান বিন। প্রথম অভিযান থেকে দ্বিতীয় অভিযানটি দুদিন বেশি হয়েছিল। কনরেড এবং বিন দুজনই মডিউল থেকে দুবার চাঁদে নেমে পদচারণা করেন, প্রতিবারই তারা চার ঘণ্টার মত সময় তাদের নভোযানের বাইরে ব্যয় করেন। তারা অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেন এবং বেশি বেশি করে মাটি ও পাথর বয়ে আনেন। তারা আরও কিছু রত্ন পৃথিবীতে বয়ে আনেন। এ অভিযানের বছর তিনেক আগে আমেরিকা একটি মানুষ বিহীন নভোযান চাঁদে পাঠিয়েছিল। অ্যাপোলো ১২ যানটি এ যানের খুব কাছেই অবতরণ করে। কনরেড এবং বিন এ যানটি থেকে ক্যামেরা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পৃথিবীতে বয়ে আনে যাতে বিজ্ঞানীরা সেগুলি পরীক্ষা করতে পারেন।

এর নয়মাস পর জেমস লোভেল, জন স্যুইজাট এবং ফ্রেড হেইজ নামে তিন-জন নভোচারী 'অ্যাপোলো ১৩-তে করে যাত্রা করেন। কিন্তু তাদের কপাল খুব খারাপ ছিল বলেই হয়তো তারা চাঁদে অবতরণ করতে পারেননি। এ অ্যাপোলো ১৩ নভোযানটি পৃথিবী থেকে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত বেশ ভাল ভাবেই যাচ্ছিল। কিন্তু তারপরই সার্ভিস মডিউল থেকে একটা বিস্ফোরণের শব্দ আসে। এ সময়েই লাল ও হলুদ রং-এর বিপদ সংকেত বাতিগুলি নভোচা-রীদের কেবিনে ও কন্ট্রোল সেন্টারে জ্বলে উঠে। অ্যাপোলোর কমাণ্ডার তখন কন্ট্রোল সেন্টারকে জানিয়ে দেন "আমরা গ্যাসের মত কিছু মহাশূন্যে নির্গত করছি"।

এ গ্যাস ছিল অক্সিজেন। এ দুর্ঘটনার সময় একটি অক্সিজেনের ট্যাংক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় এবং অপর একটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে নভোযানের প্রয়ো-জনের অক্সিজেন সব বেরিয়ে যেতে থাকে।

www.pathagar.com

এসময়ে আবার অ্যাপোলো নভোযানের প্রধান বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাতে গোলযোগ দেখা দেয়। এছাড়া আরো অনেক রকম যান্ত্রিক গোলযোগও আরম্ভ হয়। ফলে নভোচারীদের ভয়ানক রকম বিপদের মধ্যেও পড়তে হয়। কারণ পৃথিবীতে পৌঁছার পূর্বেই হয়তো তাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ঘাটতি হতে পারে। আর অক্সিজেন ছাড়া তো বাঁচার প্রশ্নই জাগে না। আবার নানারকম যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দেয়ার ফলে নভোচারীরা হয়তো তাদের ক্ষতিগ্রস্ত নভোযান ঠিকও করতে পারবেন না। আর অক্সিজেনের অভাবের জন্য তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ পানিরও ঘাটতি হতে পারে। এ দুর্ঘটনার ফলে নভোযানটি হয়তো এর পথে চলতে চলতে চাঁদের মাটিতে ধ্বংস হয়ে যাবে। হয়তো বা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সময় এটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। অথবা হয়তো এটা পৃথিবীতে না পৌঁছে মহাশূন্যে হারিয়ে যাবে। এতগুলি সত্ত্বেও মিশন কন্ট্রোলের একটামাত্র চিন্তা ছিল কি করে মানুষদের জীবন বাঁচানো যায়।

নিয়ন্ত্রকগণ নভোচারীদের সাথে পৃথিবীতে নিরাপদে কিভাবে পৌঁছানো যায় তা নিয়ে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করেন। এর বিপদ সত্ত্বেও লভেল, সুইজাট এবং হেইস বেশ শান্ত ছিলেন। নিয়ন্ত্রকদের সাথে আলাপ আলোচনার পর ঠিক হল যে, নভোচারিগণ কমাণ্ড মডিউলের পরিবর্তে লুনার মডিউলে থাকবেন। কারণ এটার বৈদ্যুতিক খরচ কম এবং এবস্থায় এটাই তাদের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের দিক নির্দেশ করবে। এভাবে নভোযানটি যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কাছাকাছি আসবে তখন ক্রগণ আবার কমাণ্ড মডিউলে চলে গিয়ে লুনার মডিউলটিকে মুক্ত করে দিবেন। ফলে তারা কমাণ্ড মডিউলে করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রত্যাবর্তন ও পৃথিবীতে অবতরণ করতে পারবে।

এ প্লানটির কোন নিশ্চয়তা ছিল না এবং এর ঝুঁকি এবং বিপদ ছিল প্রচুর। ক্র এবং নিয়ন্ত্রকদের প্রচুর খাটতে হয়েছিল এ ক্ষতিগ্রস্ত নভোযানটিকে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে। লভেল, সুহজাট ও হেইস লুনার মডিউলে প্রবেশ করেন এবং নিয়ন্ত্রকরা তাদের কম্পিউটারে এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রের সাহায্যে নভোচারীদের নির্দেশ দিয়ে এ মারাত্মক যাত্রায় তাদের সহায়তা করেন। নিয়ন্ত্রকগণ তাদের কাজের ধারা দেখে একটার পর একটা নির্দেশ দিয়ে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। বিজ্ঞানী, নভোচারী, প্রকৌশলী এবং অন্যান্য টেকনি-

www.pathagar.com

শিয়ান মিলে প্রায় ১০,০০০ লোক এ বৃহত্তর উদ্ধারকার্যে সাহায্য করেন। এ সময়ে বিশ্ব যেন বিমূঢ় হয়ে বসেছিল কি হয় শোনার জন্য।

প্রায় সাড়ে তিন দিন ধরে এ ক্ষতিগ্রস্ত যানটি মহাশূন্যের মধ্যদিয়ে পৃথিবীর দিকে প্রত্যাগমন করে। সকল রকম বিপদ কাটিয়ে অবশেষে যানটি প্রশান্ত মহাসাগরের এক স্থানে অবতরণ করে। তাদের এই মারাত্মক অভিযান সত্ত্বেও লভলে, সুইজাট এবং হেইসকে তাদের কোন অবান্তরই হয়নি। তাদের মধ্যে একজন সাংবাদিকদের বলেন "মহাশূন্যে সব সময়ই বিপদের সম্ভাবনা থাকে। আমরা সব সময়ই এরকম বিপদকে মেনে নেই"। আরেকজন সাংবাদিক তাদের প্রশ্ন করেন তারা কি আবার মহাশূন্যে যেতে চান কিনা। তারা উত্তর দেন অবশ্যই "এতে লভেল হেসে বলে উঠেন" আমি মঙ্গল গ্রহে যেতে চাই কিন্তু আমার ভয় হয় আমি বোধ হয় অতদিন বাঁচবো না।

অ্যাপোলো ১৩ নভোযানের অভিযান ব্যর্থ হলেও এতে নভোচারী ও যানকে যেমন করে উদ্ধার করা হয় তা মানুষের এবং বিজ্ঞানীদের অভূতপূর্ব বিজয়। মহাশূন্যের ইতিহাসে এটা সবসময়েই লেখা থাকবে। ১৯৭১ সনের প্রথম দিকে অ্যালান শেপার্ড মহাশূন্যে আমেরিকার প্রথম নভোচারী, এডগারমিশেল এবং স্টুয়াট রুজা অ্যাপোলো ১৪-তে করে আরেকটি চন্দ্র অভিযান চালান। এ অভিযানে তাদের অনেক রকম অভিজ্ঞতা হয়। যাত্রার প্রথম পর্যায়েই গণ্ডগোল শুরু হয়। নভোচারীরা লুনার মডিউলটিকে মূলযান থেকে ছুটিয়ে অবস্থান পরিবর্তন করেন যাতে করে অবতরণের অংশটি মূলযানের পেছনের পরিবর্তে সামনে আসে। কিন্তু এদুটিকে আবার একত্রে সংযোজিত (ডকিং) করতে গিয়ে তাদের মহাঝামে-লায় পড়তে হয়। কোন এক রহস্যজনক কারণে কমাণ্ড ও লুনার মডিউল দুটি আবার মিলিত হতে চাচ্ছিল না। অবশেষে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা খাটুনির পর এ দুটিকে একত্রে সংযোজিত করেন।

এরপর মিশন কন্ট্রোলের একটা খুব কঠিন কাজের মীমাংসা করতে হয়। সেটা হল এবস্থায় কি তারা তাদের যাত্রা চালিয়ে যাবে? এ অবস্থা আবারও সংঘঠিত হতে পারে অবতরণের পরে। তাদের মুনশিপের সাথে মিলিত না হতে পেরে চাঁদেই থাকতে হতে পারে তার মানে মৃত্যু। নিয়ন্ত্রকগণ সবরকম বিপদের সম্ভাবনা চিন্তা করে সেগুলিকে কিভাবে কাটান যায় তা ঠিক করেন। নভোচারীরা এ দুর্ঘটনা কেন হল তা নিয়ে নভোযানে অনেক রকম পরীক্ষা

www.pathagar.com

চালান। কিন্তু উত্তরটা রহস্যাবৃতই রয়ে গেল। কিন্তু সেখানে কোন যান্ত্রিক গোলযোগ ছিলনা। মিশন কন্ট্রোল থেকে গোলযোগগুলিকে মারাত্মক গোলযোগ মনে না করে অবশেষে যাত্রা চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়। এর ফলে নভোচারীরা বেশ আনন্দিত হন। "অ্যাপোলো ১৪" নভোযানটি চাঁদের চারিদিকের কক্ষপথে আবর্তন করার সময় শেপার্ড এবং মিশেল চাঁদে নামার জন্য প্রস্তুত হয়ে নেন। তারা লুনার মডিউলে চড়ে এটাকে মূলযান থেকে ছুটিয়ে নিয়ে কোন ঝামেলা ছাড়াই অবতরণ করতে থাকেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই তাদের মহা ঝামেলায় পড়তে হয়। অবতরণের সময় একটি কম্পিউটার হঠাৎ করেই অবতরণের অংশটিকে একটি ভুল আদেশ দিতে থাকে। সেটা অবতরণের অংশটিকে অবতরণ না করার আদেশ দেয়। কিন্তু নিয়ন্ত্রকগণ সাথে সাথেই নতুন করে কম্পিউটারের ভেতরে অবতরণের আদেশ দিলে তা ঠিক করে কাজ করে এবং নভোচারীরা নিরাপদেই চাঁদে অবতরণ করেন।

শেপার্ড এবং মিশেল চাঁদের বুকে আরো অনেক নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বসান এবং নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। এছাড়া তারা প্রচুর পরিমাণ চাঁদের মাটি ও পাথর পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের জন্য সংগ্রহ করেন। তারা এগুলি বহন করার জন্য ছোট একটি বাহক নিয়ে যান এবং তা ভর্তি করে মহাকাশযানে নিয়ে আসেন। নভোচারিগণ চাঁদের বুকে তিন কিলোমিটারের মত একটি লম্বা হাটা দেন। এছাড়া প্রায় ১৩০ মিটার লম্বা একটি টিলাতেও তারা উঠতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রখর সূর্যতাপ ও তাদের ভারী স্পেসস্যুট-এর জন্য তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। ফলে একেবারে চূড়া পর্যন্ত তারা পৌঁছুতে পারেনি। শেপার্ড চাঁদে একটি ছোট খাট খেলার ব্যবস্থা করেন। তিনি একটা গলফের বল নিয়ে মাটি খোড়ার যন্ত্র দিয়ে বারিমারেন। চাঁদের দুর্বল মহাকর্ষ বলের জন্য গলফ বলটি অনেক দূরে গিয়ে পড়ে। এতে তিনি খুশী হয়ে বলে উঠেন "আমি যদি এরকম করে এর দূরে গলফ বল পৃথিবীতে ছুড়তে পারতাম"। এদুজন নভোচারী চাঁদের বুকে তেত্রিশ ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করেন। তারপর তারা চাঁদ ছেড়ে তাদের একান্ত একাকি সাথী স্টুয়াট রুসার সাথে পার্কিং অরবিটে মিলিত হন। তারা খুব সঠিকভাবে মহাকাশযান দুটির ডকিং কার্য পরিচালনা করেন। ফলে কোন অসুবিধা ছাড়াই তারা আবার একত্রে মিলিত হন। এর কয়েকমাস পর ডেভিড স্কট জেমস্ ইরউইন এবং আলফ্রেড ওরডেন এপোলো ১৫ নভোযানে করে আরেকটি যাত্রা

www.pathagar.com

পরিচালনা করেন। তারা তাদের সাথে করে একটি গাড়িও এবার নিয়ে যান এবং চাঁদের বুকে অভিযান করেন। এগাড়িটির নাম তারা দেন "লুনার রোভার" এটা প্রায় তিন মিটার লম্বা এবং এটি ছিল বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা চালিত।

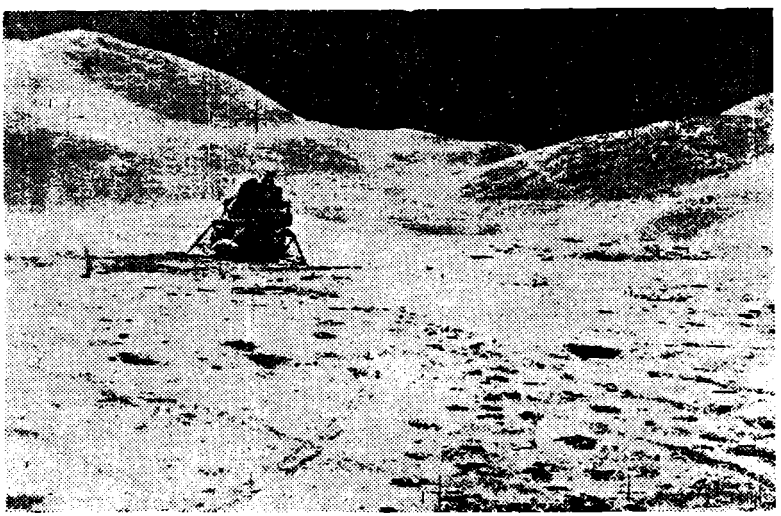

চাঁদের মাটিতে অ্যাপোলো 15-এর কমান্ড মডিউল।

এটার চাকার প্রত্যেকটিতেই আলাদা আলাদা মোটর ছিল। এতে শত শত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বসানো ছিল এবং এটি বেশ কয়েক টন চাঁদের মাটি ও পাথর বহনে সক্ষম ছিল। এ যানটিকে ভাজ করে লুনার মডিউলের বাহিরের দিকে বসানো হয়।

যখন স্কট এবং ইরউইন চাঁদে অবতরণ করে। তখন তারা একটি দড়ি ধরে টান দেন। এতে স্বয়ংক্রিয় ভাবে এটা ভাজমুক্ত হয়ে আস্তে আস্তে চাঁদের মাটিতে এসে পড়ে। এদুজন নভোচারী চাঁদের বুকে প্রায় তিনদিন অতিবাহিত করেন। প্রতিদিনই তারা লুনার রোভারে করে চাঁদের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে অভিযান চালান। এ গাড়ির যন্ত্রপাতি দিয়ে তারা অনেক নতুন পরীক্ষা চালান। সময়ে সময়ে তারা রোভারে করে গাদা গাদা চাঁদের মাটি ও পাথর এনে লুনার মডিউলে জমা করেন। তাদের যাত্রার দ্বিতীয় দিনে, স্কট এবং ইরউইন চাঁদের মাটির উপরের স্তর খুড়ে এক প্রকার পাথর দেখতে পেয়ে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে পরেন। এগুলি ছিল

www.pathagar.com

CRYSTALLISED ROCK এবং সাধারণত এগুলি পাওয়ার কথা ছিল চাঁদের মধ্যস্থানে। ফলে এগুলিকে পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা অতি সহজেই চাঁদের উৎপত্তি সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

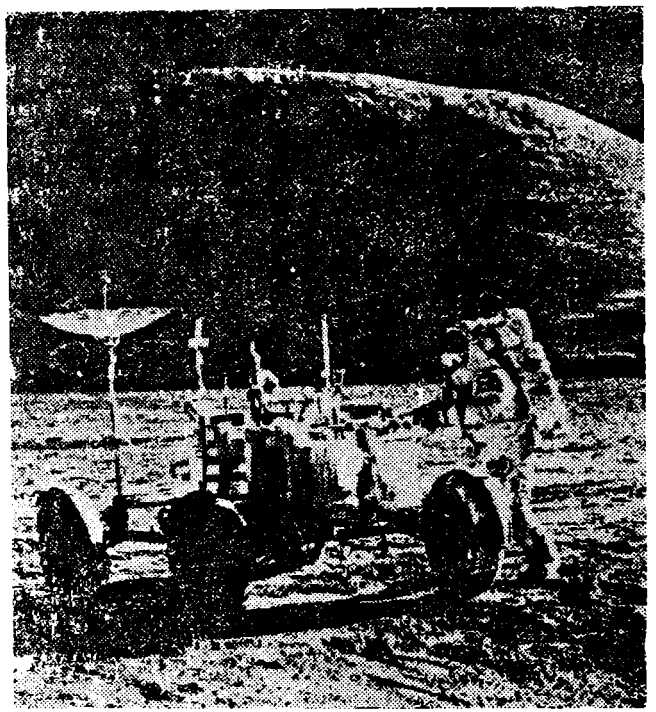

তাঁরা চাঁদের বুকে গাড়ি দিয়ে সবকিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন।

১৯৭২ সনের মার্চ মাসে জন ইয়াং চার্লস ডিউক এবং কেন মেটিংলে অ্যাপোলো ১৬-তে করে চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। কিন্তু তাদের এ অভিযান প্রায় বাতিল হতে যাচ্ছিল। ইয়াং এবং ডিউক লুনার মডিউলে উঠে নামার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। মেটিংলি লুনার মডিউলটিকে প্রধান যান থেকে ছুটিয়ে দেন এবং ভেসে যেতে দেখেন। তারপর যখনই তার কমাণ্ড মডিউলের ইঞ্জিন চালু করতে যাবেন তখনই একটি বিপদ সংকেত বলে উঠে যে, এতে কিছু যান্ত্রিক গোলযোগ আছে। ফলে ম্যাটিংলির ইঞ্জিন চালু করার সাহস হয় না। তিনি ভয় পান যে, যদি ভুল পথে মহাকাশযানটি চলে যায় তাহলে নোভোচারিগণ

www.pathagar.com

আর কখনও পৃথিবীতে ফিরতে পারবেন না। তাদের তাহলে মহাশূন্যেই মৃত্যু-বরণ করতে হবে।

হিউস্টনে নিয়ন্ত্রকগণ এতে বেশ বিবৃত বোধ করেন। তাদের মধ্যে অনেকেই নভোচারীদের সরাসরি পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে মনস্থ করেন। কিন্তু মিশন কন্ট্রোল মত প্রবর্তন করার পূর্বে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

এবস্থায় নভোচারিগণ বেশ কয়েক ঘণ্টা চাঁদের চারিদিকের কক্ষপথে আবর্তন করতে থাকেন। ইতিমধ্যেই হিউস্ট্রনে বিজ্ঞানিগণ সিমিউলেটর নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। এসব পরীক্ষার পর দেখা যায় যে নভোচারিগণ কোন বিপদের মধ্যেই নেই। ফলে মিশন কন্ট্রোল থেকে তাদের চাঁদের বুকে নামার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। মেটিংলি ইঞ্জিন চালু করেন এবং কমাণ্ড মডিউলটি অধিক উঁচুতে কক্ষপথে আবর্তিত হয়।

ইয়াং এবং ডিউক চাঁদে অবতরণ করে তিনটি ব্যস্ত দিন অতিবাহিত করে। অ্যাপোলো পনেরো এর নভোচারীদের মত তারা গাড়ি চালিয়ে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে নুড়ি ও বালি যোগার করেন। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে তারা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বহন করে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। এভাবেই তাদের যেই অভিযানটি আরেকটু হলেই পণ্ড হত তা তাদের জন্য এক বড় বিজয় উপহার দেয়। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে EUGENE CERNAN, HARRISON SCHMITT এবং RONALD EVANS "এপোলো সতেরো"-তে করে চাঁদের বুকে শেষ অভিযান পরিচালনা করেন। এ অ্যাপোলো ১৭ যানটিকে ছাড়া হয় ভোরের আলো ফোটার আগে ফলে কমলা রং-এর যে আগুনের ফুলকি বের হচ্ছিল তা বহু কিলোমিটার দূর হতেও দেখা যায়। আর রাতের পরিবেশে এটি এক অদ্ভুত দৃশ্যের সৃষ্টি করে। CERNAN SCHMITT চাঁদের বুকে অবতরণ করেন এবং তাদের এ অভিযানটি মোট ছটি অভিযানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়।

নভোচারিগণ চাঁদের বুকে একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করেন। এ পরীক্ষাগারের সকল ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি পারমাণবিক শক্তি দ্বারা চালিত। এ পরীক্ষাগারটি হতে এখনও পৃথিবীর মানুষ চাঁদের বুক হতে সমস্ত তথ্যাদি পাচ্ছে। এদুজন নভোচারী "লুনার রোভারে" করে চাঁদের বুকে অভিযান কার্য চালান।

www.pathagar.com

এক যাত্রায় তারা প্রায় ১৬ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেন। সেটা ছিল গাড়িতে করে চাঁদের বুকে দূরতম যাত্রা।

একদিন তারা হাটতে বের হয়ে একটি ফাটলের চারিদিকে জায়গাটা ঘুরে দেখছিলেন। CERNAN মজা করে একটি উঁচু মাটির জায়গাকে পা দিয়ে ঠেলা দিতেই মাটি উপড়ে এল। এতে এক অত্যাশ্চর্যক খবর পৃথিবীর মানুষ জানতে পারে। এ মাটির রং ছিল কমলা রং-এর। SCHMITT এগিয়ে গিয়ে কিছু মাটি খুড়ে দেখেন যে পৃষ্ঠের নিচে মাটির রং কিরকম। তিনি দেখতে পান যে সেখানকার মাটির রং-ও কমলা রং-এর। এরূপ একটি হঠাৎ হয়ে যাওয়া আবিষ্কার প্রমাণ করে যে চাঁদের বুকে এককালে পানি ছিল। বহু লক্ষ বছর আগে পানি পাথরের মধ্যকার লোহাতে মরিচা ফেলে। আর সে মরিচা থেকেই মাটির রং এরকম কমলা রং ধারণ করে। এর ফলে নতুন যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় সেটা হল: চাঁদে এখনও পানি আছে কিনা?

উত্তেজিত নভোচারীরা তৎক্ষণাত কিছু মাটি পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের জন্য নিয়ে আসেন। এর পরদিন CERNAN SCHMITT চাঁদের বুক ছেড়ে মহাশূন্যে রোনাল্ড ইভান্স-এর সাথে মিলিত হন। নভোচারিগণ চাঁদের চারিদিকে বহুবার প্রদক্ষিণ করে ছবি তোলেন। তারপর তারা তাদের সম্পদ নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। এযাত্রা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই এপোলো যানের চাঁদ অভিযান শেষ হয়। খুব সম্ভবতঃ আমেরিকার নভোচারীরা এ শতাব্দীতে আর চাঁদে অবতরণ করবেন না। পৃথিবীর নাটি দেশের প্রায় ১০০০ বিজ্ঞানী চাঁদ থেকে আনা সব রকমের পাথর মাটি পরীক্ষা করতে থাকেন। এসব জিনিস এবং নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদি পৃথিবীর মানুষকে ইতিমধ্যে চাঁদের বয়স এবং গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্যাদি প্রদান করে। বিজ্ঞানীরা এখন মনে করেন যে চাঁদের গঠন পৃথিবীর গঠনের অনুরূপ। তারা বিশ্বাস করেন যে, চাঁদটি সম্ভবতঃ ৫০০০ মিলিয়ন বছরের পুরানো, কিন্তু এটা কোথা থেকে সৃষ্টি তা তারা এখনও বের করতে পারেননি। অনেকেই ভেবেছেন চাঁদটি বোধ হয় এক সময় পৃথিবীরই অংশ বিশেষ ছিল। অবশ্য বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে এটা ঠিক নয়। অনেকে মনে করেন যে চাঁদের বয়স পৃথিবী থেকেও বেশি। তবে এটা একটি তথ্য মাত্র। সুতরাং এটা কতটুকু সত্য তা বলা যায়না।

এসময়ে রাশানরাও চাঁদ থেকে পাথর ও মাটি সংগ্রহ করছিলেন তবে আমেরিকানদের মত তারা এসব জোগাড় করতে কোন মানুষকে চাঁদে পাঠাননি, তারা

www.pathagar.com

এতে মানুষ বিহীন নভোযান ব্যবহার করেন। "লুনা ষোল" নামে একটি মানুষ-বিহীন যান চাঁদে গিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাথর যোগার করে আবার চাঁদপৃষ্ঠ থেকে উড্ডয়ন করে সেগুলি নিয়ে রাশিয়ার মাটিতে ফিরে আসে। এর কয়েক মাস পরে তারা লুনা সতেরো নামক আরেকটি নভোযান উড্ডয়ন করে। এটিতে লিউনোকোর্ড নামে একটি অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রছিল। এ যন্ত্রটির ৮টি চাকা ছিল। যা দ্বারা এটি নিজে নিজেই চাঁদের বুকে ঘুরে ফিরে পাথর জোগাড় করতে পারত। রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণকক্ষ এতে আদেশ দিলেই এই LINOKHOD সেগুলি ঠিক ঠিক ভাবে পালন করত।

সম্ভবতঃ রাশানরা এসব পরীক্ষা করে নতুন কিছু তথ্যাদি পেয়ে ছিলেন। কিন্তু তা পৃথিবীর মানুষকে আর জানানো হয়নি। বিজ্ঞানিগণ শুধু চাঁদের ইতি-হাস জানার জন্যই গবেষণা চালিয়ে যাননি। তারা এর সাথে সাথে চাঁদকে মানুষের কি কাজে নাগানো যায় তাও পরীক্ষা করে দেখেন। যেমন চাঁদে এমন একটি পরীক্ষাগার বানানো সম্ভব যেখানে ডাক্তারগণ সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত ও বায়ুহীন পরিবেশে জটিল রোগের জীবাণু নিয়ে গবেষণা করতে পারবেন। উদাহরণ-স্বরূপ ক্যান্সারের কথাই ধরা যাক।

এমনকি চাঁদ যদি আমাদের কোন কাজেও না আসে তবুও চাঁদকে জয় করতে গিয়ে মানুষ যেসব কাজ করেছে তাই মানুষকে উন্নতির জন্য অনেকখানি পথ এগিয়ে দিয়েছে। মানুষ বিহীন উপগ্রহগুলি এখন আমাদের অনেক কাজ করে দিচ্ছে। টেলিকমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, এতে টেলিভিশন, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ সবই সংযুক্ত। টেলিকমিউনিকেশন মানে হচ্ছে দূর থেকে যোগাযোগ করা। এক্ষেত্রে উপগ্রহগুলি হল মহাশূন্যের রেডিও স্টেশন যেগুলি টিভি, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতির তথ্যাদি পৃথিবীর সর্বত্র পাঠায়। এ টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা এখন পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই প্রচলিত। আব-হাওয়ার খবর জানার জন্যও এখন উপগ্রহ ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব উপগ্রহে যেসব ক্যামেরা থাকে সেগুলি পৃথিবীর চারিদিকের মেঘের ছবি তোলে রাখে।

আবহাওয়া দপ্তরের মানুষরা শুধু পৃথিবীর একাংশ দেখতে পান কিন্তু একটি উপগ্রহ সমগ্র পৃথিবীটিকেই দেখতে পায়। যেসব স্থান আবহাওয়া দপ্তর থেকে দেখতে পাওয়া যায় না সেসব স্থানের আবহাওয়ার ছবি উপগ্রহের মাধ্যমে তারা পেয়ে যান। এর ফলে তারা সঠিকভাবে কোন স্থানের আবহাওয়ার খবর

www.pathagar.com

প্রদান করতে পারেন। এছাড়া পরে আবহাওয়া কি হবে তা আগে থেকেই তারা বলে দিতে পারেন। এটা কৃষকদের জন্য একটা বড় ধরনের সুবিধা। এছাড়া আরো অনেকভাবে একটি উপগ্রহকে কাজে লাগানো যায়। যারা মানচিত্র অংকন করেন তাদের জন্য নানা স্থানের ছবি উপগ্রহ দিয়ে তোলা যেতে পারে। এগুলি বনাঞ্চলের দিকে খেয়াল রেখে কোথাও কোন আগুন লাগালো কিনা তার খবরাখবর দিতে পারে। শস্যতে পোকার আক্রমণ হল কিনা তার সঠিক খবরা-খবরও এসব উপগ্রহ থেকে পাওয়া যেতে পারে। মাটির নিচে পানির সন্ধান করতে এগুলি মানুষকে সহায়তা করতে পারে। সাগরে মাছের অস্তিত্ব জানতে জেলেদের এর চেয়ে বড় সহায়ক আর নেই। এছাড়া জাহাজ ও উড়োজাহাজ-গুলিকে সারা পৃথিবীর পথ দেখাতেও এদের কাজে লাগানো যায়।

উপগ্রহের নানাবিধ ব্যবহার ছাড়াও পৃথিবী আরো অনেক সুবিধাদি অর্জন করে। মহাকাশযান বানাতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের নানা ধরনের ছোট খাট অনেক জিনিস আবিষ্কার করতে হয়। এসব জিনিসগুলির অনেকগুলিই এখন নানা-বিধ কাজকে সঠিকভাবে করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ডাক্তারগণ এদের কিছু কিছুকে জটিল অস্ত্রোপ্রচারের কাজে ব্যবহার করে থাকেন, যেগুলি ঠিক কয়েক বছর আগেও সম্ভব ছিল না। রসায়নবিদগণ রকেট ও মহাকাশযান তৈরির জন্য নানা রকমের নতুন নতুন ধাতুও আবিষ্কার করেন। এগুলির মধ্যে প্লাস্টিকসহ আরো বিভিন্ন ধরনের অতি উচ্চ তাপসহ ধাতুও আছে। এখন-কার অনেক কিছুই তখন যেসব বস্তু রাসায়নিকবিদরা আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলি দিয়ে তৈরি।

যেসব মিলকারখানায় এগুলি তৈরি হয়েছিল সেগুলির জিনিসপত্র তৈরির ক্ষমতা অনেক গুণে বেরে যায় এসব জটিল দ্রব্য তৈরি করতে করতে। এসব কারখানার কার্যক্ষমতা ও কাজ করার নিয়মকানুন এখন পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশের কারখানাগুলিতে অনুসরণ করা হয়। এ নতুন মহাকাশ যুগের প্রারম্ভ পৃথিবীর জীবিত প্রাণীদের অনেকাংশে লাভবান করে দিয়ে যায়।

———

www.pathagar.com

১২

মহাকাশের নতুন যুগ

চন্দ্র বিজয়ের পর ১৯৭১-এর এপ্রিল মাসে রাশান বিজ্ঞানীরা মহাকাশে এক নতুন ধরনের পরীক্ষা শুরু করেন। তারাই মহাকাশে একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার স্থাপনের সর্বপ্রথম সচেষ্ট পদক্ষেপ নেন। রাশানরা স্যালুয়্যট নামে এক মানুষবিহীন পরীক্ষাযান উড্ডয়ন করেন। এটা ছিল একটা লম্বা ও গোলাকার বস্তু এবং এটিতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কার্য চালানোর জন্য বিভিন্ন ভাগ ছিল। এর উড্ডয়নের চারদিন পরে "স্যায়ুজ ১০-এ করে" তিনজন রাশান নভোচারী স্যালুয়েটকে মহাকাশে অনুসরণ করেন। তারা স্যালুয়্যট-এর সাথে কয়েক ঘণ্টার জন্য মিলিত হন এবং তারপর পৃথিবীতে ফিরে আসেন। বেশির ভাগ লোকই মনে করেছিলেন যে, পরীক্ষাটি সফল হয়নি।

এর পরের দেড় মাস আর কোন কিছুই ঘটেনি। এরপর জুন মাসের প্রথম দিকে রাশান বিজ্ঞানীরা তিনজন নভোচারীসহ "স্যায়ুজ ২" মহাকাশযান মহাকাশে পাঠান। মজার ব্যাপার হল ইংল্যাণ্ডের একটি স্কুলে একদল স্কুলছাত্র সর্বপ্রথম এ যানটির অবস্থান নির্ণয় করে। তারা যানটির তারবার্তা মাত্র পঁচিশ পাউণ্ড দামের একটি যন্ত্রদিয়ে ধারণ করে এবং রাশিয়া কোন খবর দেয়ার একঘণ্টা আগেই তারা সারা বিশ্বকে এ অভিযানের কথা জানিয়ে দেয়। পরদিন "স্যায়ুজ দুই" যানটি মহাশূন্যে স্যালুয়েট মহাকাশ পরীক্ষাগারের সাথে মিলিত হয়। তিনজন নভোচারী GEORGI DOBROVOLSFY, VIKTOR PATSAYER VEADISLAV VOLKOV যোগাযোগ সুরঙ্গের মধ্যদিয়ে বুকে হেটে পরীক্ষাগারে প্রবেশ করেন। তাদের এ অভিযানে তারা প্রতিদিনই পরীক্ষাগারে গিয়ে কাজ করতেন। কাজ শেষে তারা আবার বুকে হেটে মূলযানে ফিরে আসতেন। তারপর খাবার রান্না করে খেয়ে ঘুমাতেন। তারা এ যানে নানারকম পরীক্ষাকার্য চালান। তারা মহাকাশ থেকে পৃথিবী, চাঁদ ও নক্ষত্রসমূহ পর্যবেক্ষণ করেন। এ অভিযানে তারা নানারকম নতুন সব তথ্য আবিষ্কার করেন এবং তাদের এ অভিযান ছিল মহাকাশ বিজয়ের নতুন এক ধাপ।

www.pathagar.com

নভোচারীরা পৃথিবীর চারিদিকে মোট বিশ দিন প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাদের যাত্রা ছিল খুবই সুন্দর এবং তাতে কোন গোলমালও ছিল না। "স্যায়ুজ দুই" যানটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং প্যারাস্যুট খুলে গিয়ে এর গতিবেগ কমে আসে। অতঃপর খুব মসৃনভাবে এটি নির্দিষ্ট জায়গায় অবতরণ করে।

হেলিকপ্টারে করে উদ্ধারকারীরা এগিয়ে গিয়ে যানের দরজা খোলেন। কিন্তু সাথে সাথে অত্যন্ত দুঃখে জর্জরিত হয়ে পড়েন। তারা দেখেন যে তিনজন নভোচারীর সকলেই মৃত। তারা সকলেই নিজ নিজ জায়গায় ছিলেন এবং তাদের বেশ শান্তশিষ্ট দেখাচ্ছিল, তাদের কোন দিক দিয়েই কোন ভোগান্তি হয়েছে বলে মনে হয়নি। নভোচারীর সকলেই বিবাহিত ছিলেন এবং তাদের ছেলে-মেয়েও ছিল। সারা বিশ্ব এ খবরে বেশ ভেঙ্গে পড়েন। রাশিয়াতে অনেক মানুষ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং কেউ কেউ জ্ঞানও হারান।

রাশান বিজ্ঞানীরা তৎক্ষণাত নভোচারীদের মৃত্যুর কারণ উদ্‌ঘাটন করতে সচেষ্ট হন। অনেকগুলি কারণেই এ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তবে তার মধ্যে সবচেয়ে সঙ্গত কারণ হল, মহাকাশযানের ভেতর হঠাৎ চাপের হ্রাস ঘটা। যখন ভেতরে চাপের হ্রাস ঘটেছিল তখন নভোচারিগণ আর শ্বাস প্রশ্বাস কার্য চালাতে পারেননি। সম্ভবতঃ যানটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করা মাত্রই এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। আর তাই যদি হয়। তবে তাদের মৃত্যু ঘটে যানের অবতরণের মাত্র কয়েকমিনিট পূর্বে। ১৯৭৩ সালের মে মাসে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা বেশ বড় মহাকাশ পরীক্ষাগার উড্ডয়ন করেন। এটার নাম হল স্কাইল্যাব। এটাতে ক্রুদের জন্য তিনটি শোবার ঘর, একটি গোসল খানা, একটি পাকঘর, একটি বসার ঘর এবং একটি ওয়ার্কশপ ছিল। এ ওয়ার্কশপেই নভোচারিগণ মহাকাশের অবস্থা এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতেন। এ স্কাইল্যাব এ নভোচারীদের তিনটি গ্রুপ পর্যায়ক্রমে কাজ করেন।

এদের সবারই স্কাইল্যাব-এ তাদের প্রথম দিনে তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। নভোচারীদের প্রথম দলে ছিলেন CHARLES CONRAD, JOSEPH KERWIN এবং PAUL WEITY তারা প্রথম দিনেই দেখতে পান যেই পাতটি পরীক্ষাগারটিকে সূর্যের প্রচণ্ড তাপ থেকে রক্ষা করে সেটা ভেঙ্গে

www.pathagar.com

গিয়েছে। আর তার মানে এ প্রচণ্ড সূর্যের তাপ সহ্য করে তারা আর পরীক্ষাগারে থাকতে পারবেন না। কিন্তু তাদের ইচ্ছা ও দৃঢ় মনোবলে তারা এ অসুবিধা কাটিয়ে উঠেন। তারা তিনজনে মিলে একটি সানণ্ডে তৈরি করেন এবং CONRAD এবং WEITY মহাকাশে বের হয়ে ভেসে ভেসে তা মহকাশ স্টেশনে লাগিয়ে দেন। এটাই ছিল মহাকাশে মানুষের প্রথম মেরামতকার্য।

নভোচারীদের দ্বিতীয় দলে যারা ছিলেন তারা হলেন ALAN BEAN, OWEN GARRIET এবং JACK COUSMA তারা যখন এপোলোযানে করে স্কাইল্যাবে প্রায় পৌঁছে গেছেন তখনই তাদের যানে মারাত্মক যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। তাদের হয়তোবা আর পৃথিবীতে ফিরে আসা সম্ভব হত না। নিয়ন্ত্রকগণ তাদের রেসকিউ করার জন্য আরেকটি রকেট পাঠানোর পরিকল্পনা করতে থাকেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমেই বলতে হয় তারা এ সমস্যা কাটিয়ে উঠেন এবং নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

নভোচারীদের তৃতীয় দলটিতে ছিলেন GERALD CARR, WILLIAM POGUE এবং EDWARD GIBSON কিন্তু স্কাইল্যাবে পৌঁছে তারা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারা এতই অসুস্থ হয়ে পড়েন যে তাদের কাজ তারা ঠিকমত করতে পারছিলেন না। তাদের কিছু কাজ তারা অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই ফেলে রাখেন এবং যত সব ছোট খাঁট ভুলত্রুটি করেন। তবে সুস্থ হওয়ার সাথে সাথেই তারা আবার সঠিকভাবে কাজ করতে শুরু করেন। এত জটিলতা এবং সমস্যা সত্ত্বেও স্কাইল্যাব অভিযানটি ছিল মানুষের জন্য এক বিরাট সফলতা। এ অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল এটা জানা যে, একজন মানুষ কতদিন মহাকাশে থাকতে এবং কাজ করতে পারে। নভোচারীদের প্রথম দলটি মহাকাশে ছিলেন একমাস, দ্বিতীয় দলটি ছিলেন দুইমাস এবং তৃতীয় দলটি ছিলেন তিনমাস। আর আশার কথা এই যে, তাদের কারোরই ফিরে আসার পর শারীরিক দিক দিয়ে কোন অসুবিধা ধরা পড়েনি। নভোচারিগণ তাদের অভিযানে শত শত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদি চালান। আর তা থেকে আবহাওয়া বায়ু দূষণ, বিকিরিণ, মহাসাগর ইত্যাদি বহু বিষয় সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। নভোচারিগণ তাদের পরীক্ষাগারে নানাধরনের দ্রব্য প্রস্তুত করেন। কোন ধারক ছাড়াই ওজনহীন অবস্থায় তারা গলিয়ে এবং একত্রিত করে এসব দ্রব্য প্রস্তুত করেন। তারা পরে তাদের তৈরি দ্রব্যাদি পৃথিবীতে কারখানায়

www.pathagar.com

তৈরি দ্রব্যাদির সাথে তুলনা করেন। তারা বিস্ময়ে দেখতে পান যে, তাদের তৈরি দ্রব্যাদিই অধিক খাটি এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ধারক পাত্রগুলিই নানা ধরনের দ্রব্যাদিকে দূষিত করে। এটা ছিল শিল্পজগতের জন্য এক অতীব প্রয়োজনীয় আবিষ্কার।

বিশেষ ধরনের ক্যামেরার সাহায্যে, বায়ুমণ্ডলের উপর হতে নভোচারীরা সূর্যের প্রায় ১২০০০ ছবি তোলেন। এসকল ছবিগুলির মধ্যে সৌর বিস্ফোরণের বেশ কিছু মজার ছবিও আছে। সূর্য থেকে নতুন ভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি উদ্ভাবন করতে এসব ছবি বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট সহায়তা করবে। নভোচারীরা এছাড়া পৃথিবীর ভূ-গঠনের উপরেও বেশ কিছু ছবি তোলেন। এসব ছবির সাহায্যে বিজ্ঞানীদের পক্ষে ধাতু, কয়লা এবং অন্যান্য খনিজপদার্থ খুঁজে বের করা সহজ হবে। এটা সত্য যে, বহু দেশের খনিজবিদগণ খনিজদ্রব্য খোঁজার কাজে এখন স্কাইল্যাব কর্তৃক গৃহীত ছবিগুলি ব্যবহার করেছেন। এথেকে সহজেই বোঝা যায় স্কাইল্যাব অভিযানের ছবি এবং তথ্যগুলো পৃথিবীর মানবজীবনকে আরো উন্নততর করে তোলেছে।

ইতিমধ্যে আমেরিকার বিজ্ঞানিগণ ৫০ অথবা ১০০ জন বিজ্ঞানীর জন্য বেশ বড় ধরনের একটি মহাকাশ পরীক্ষাগার তৈরির প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তারা এ সময়ে শ্যাটল রকেট নামক নতুন ধরনের এক মহাকাশযানের নক্‌শা করেন। ইউরোপের বিভন্ন স্থান হতে বিজ্ঞানিগণ ইঞ্জিনিয়ারগণ এ শ্যাটল রকেট তৈরি করতে 'নাসাকে' সাহায্য করেন। যে সময়ে এ রকেট তৈরির কল্পনা চলছিল সে সময়কার মহাকাশযানগুলি মাত্র একবারই যাত্রা করতে পারত। কিন্তু এ নতুন ধরনের মহাকাশযানটি প্রায় একশবার যাতায়াত করতে পারবে। রকেটগুলি হবে দুই ধাপের। এটা যানটিকে পৃথিবী থেকে উড্ডয়ন করে সরাসরি আকাশে ছুঁড়ে দেবে। যখন যানটি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৬৫ কিলোমিটার উচচতায় থাকবে তখন রকেটর দুটি ধাপ আলাদা হয়ে যাবে। তখন প্রথম ধাপটি পৃথিবীতে ফিরে আসবে এবং ঠিক উড়োজাহাজের মত মাটিতে নামবে। দ্বিতীয় ধাপটি নভোচারী এবং তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহ মহাকাশ কেন্দ্রে পেঁাছুবে এবং তারা আবার একই মহাকাশযানে করে পৃথিবীতে ফিরে আসবে।

ইতিমধ্যে রাশানরা স্যায়ূজ দুর্ঘটনার পরও একেবারে হতাশাগ্রস্ত হয়ে বসে থাকেননি। সম্ভবতঃ তারাও আগামী কয়েক বছরে আরো অনেক মহাকাশ

www.pathagar.com

কেন্দ্র মহাকাশে পাঠাবেন। এসব অভিযান ছাড়াও আমেরিকা এবং রাশিয়া উভয়েই অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহে নভোচারীবিহীন নভোযান পাঠাতে থাকেন। উভয়েই মঙ্গল এবং শুক্রগ্রহে বেশকটি মহাকাশযান পাঠায়। এসব যান এসকল গ্রহের অনেক ছবি তোলে পৃথিবীতে পাঠায়। এখন এ দুটি দেশ মহাকাশের আরোও গভীরে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করেন।

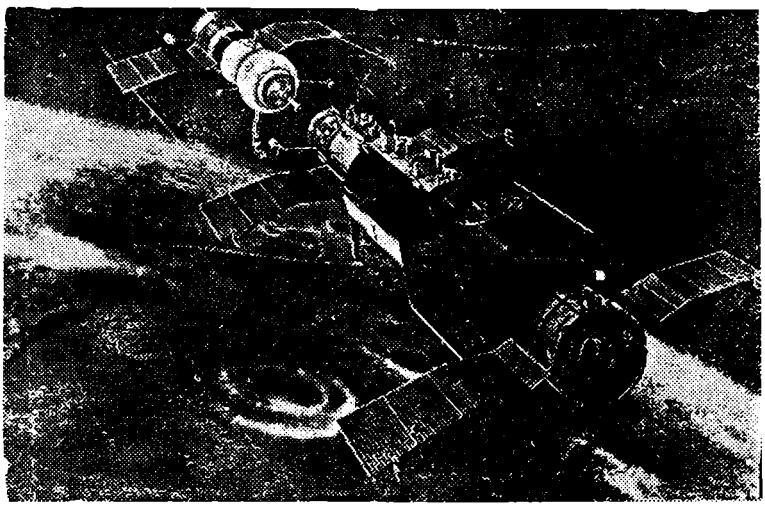

স্যায়ুজ II একটি ল্যাবরেটরীর সাথে জোড়া নেয়।

এরপর বেশ বড় ধরনের দুটি অভিযান চালানোর জন্য আমেরিকার বিজ্ঞানী-গণ প্রস্তুত হয়ে নেন। প্রথম তারা পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহে মানুষ বিহীন মহাকাশযান প্রেরণ করেন। অতঃপর ১৯৭৭ সনে তারা একটি নভোযান মহাকাশে প্রেরণ করেন। এর যাত্রা চলবে ১১ বছর ধরে। এটা প্রথমে যাবে বৃহস্পতি গ্রহে, এটার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে এটা ইউরেনাস হয়ে নেপচুনের দিকে যাত্রা করবে। এ যাত্রার পথ হবে প্রায় পাঁচ হাজার মিলিয়ন কিলোমিটারের মত। আরেকটি অভিযানে মহাকাশযানটি বৃহস্পতি, শনি হয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে দূরতম গ্রহ প্লুটোর দিকে এগুবে। পৃথিবীর থেকে প্লুটোর দূরত্ব প্রায় ৬০০০ মিলিয়ন কিলোমিটার।

www.pathagar.com

আমেরিকা এবং রাশিয়ার সবচেয়ে বড় কল্পনা ছিল মঙ্গল গ্রহে মানুষ পাঠানো। কিন্তু এ অভিযানটির জন্য অনেক প্রস্তুতির প্রয়োজন। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব মাত্র ৫ লক্ষ কিলোমিটার। কিন্তু পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহের দূরত্ব প্রায় পয়ষট্টি মিলিয়ন কিলোমিটার। চাঁদে যেতে মানুষের মাত্র কয়েকদিনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু মঙ্গল গ্রহে যেতে লাগবে খুব সম্ভব চৌদ্দ থেকে পনেরো মাস। এজন্য নতুন ধরনের পারমাণবিক শক্তি চালিত রকেট এবং মহাকাশযানের প্রয়োজন হবে। প্রায় ২০ বছর ধরে আমেরিকা এবং রাশিয়ার বিজ্ঞানিগণ স্বতন্ত্রভাবে কাজ করেন। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে আমেরিকা এবং রাশিয়ার নভোচারিগণ মহাকাশে প্রথমবারের মত মিলিত হন। এটা ছিল মহাকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

প্রথমে ALEXEI LEONOV এবং VALRRI KUBASOR নামে দুজন নভোচারী স্যায়ূজ যানে করে বৈকনুর মহাকাশ কেন্দ্র থেকে উড্ডয়ন করেন এবং পৃথিবীর চতুর্দিকের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করেন। এর প্রায় সাত ঘণ্টা পর THOMAS STAFFORD, VANEL BRAND এবং RONALD SLAYTON নামক তিনজন আমেরিকান নভোচারী অ্যাপোলো মহাকাশযানে করে মহাকাশে উড্ডয়ন করেন। এরপর প্রায় দুদিন ধরে যান দুটি একে অপরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। অবশেষে তারা উভয়ের দেখা পায় এবং ইউরোপের প্রায় ২২৫ কিলোমিটার উপরে পরস্পর মিলিত হয়। এ বৃহৎ এবং উত্তেজনাপূর্ণ মহাকাশের সাক্ষাৎ অবশেষে সফল হয়। দরজা খোলাই ছিল। আমেরিকার কমাণ্ডার TOM STAFFORD এবং রাশিয়ার কম্যাণ্ডার ALEXEI LEONOR দুই মহাকাশ যানের খালিজায়গাটুকুতে বুকে হেটে এসে মিলিত হন এবং করমর্দন করেন।

তারা দুজন কম সময়ের মধ্যেই বেশ ভাল সম্পর্ক জাগিয়ে তোলেন। আমেরিকার নভোচারী রাশান ভাষা জানতেন আর রাশান নভোচারীও ইংরেজী জানতেন ফলে তাদের দুজনের মধ্যে কোন ভাষাগত সমস্যা হয়নি। এ পাঁচজন নভোচারী একত্রে বসে তাদের খাওয়া দাওয়া করেন। রাশানরা আমেরিকা নভোচারীদের স্যায়ূজ যানে নিমন্ত্রণ করেন এবং আমেরিকানরাও রাশানদের অ্যাপোলো যানে নিয়ে তাদের খাদ্য পরিবেশন করেন। তারা সবাই আনন্দেই সময় কাটান। রাশান নভোচারীদের মধ্যে LEONOV বেশ ভাল স্কেচ করতে

www.pathagar.com

জানতেন। তিনি তিনজন আমেরিকান নভোচারীর ছবি একে দেন। এছাড়া তিনি SLAYTON এর একটি প্রতিকৃতি আঁকেন সেখানে তার মাথায় একটি কাউবয়দের টুপি পড়া ছিল।

এ অভিযানে নভোচারিগণ প্রায় ৩৫টি বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসা পরীক্ষা করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলি করা হয় তার বেশির ভাগই ইউরোপের বিজ্ঞানী এবং ডাক্তারদের মত অনুযায়ী করা হয়। এতে কিভাবে হৃদরোগ সাড়ানো যায় তা ভালভাবে পরীক্ষা করা হয়। হয়তোবা অদূর ভবিষ্যতে হৃদরোগীদের মহাশূন্যে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হবে। মহাকাশযান দুটি একত্রিত অবস্থায় পৃথিবীর চারিদিকে প্রায় দুদিন প্রদক্ষিণ করে। এরপর এ অভিযানের সময় শেষ হয়। আমেরিকান এবং রাশান নভোচারীরা দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে পরস্পরকে বিদায় জানায় এবং যানদুটি আবার আলাদা হয়ে ফিরে আসে।

এ অভিযানের সফলতা ভবিষ্যতে হয়তো মানুষের অনেক কাজে লাগবে। এ দুটি দেশ পরস্পরকে নানা দিক দিয়ে সাহায্য করতে পারবে। উভয়দেশ তাদের ধারণার রদবদল করে অনেক বড় কিছু সৃষ্টি করবে। এতে খরচ কমতো লাগবেই আর সাথে সাথে মহাকাশের যুদ্ধে মানুষ আরো বড় ধরনের পদক্ষেপ দিয়ে এগুতে পারবে।

---

www.pathagar.com

১৩

স্পেস শ্যাটল (শ্যাটল রকেট)

মহাকাশ বিজয়ের নতুন ধাপের সৃষ্টি হয় স্পেস শ্যাটল আবিষ্কারের সাথে সাথেই। এ শ্যাটলটি ঠিক দেখতে বড় ধরনের জেট বিমানের মতই এর এবং পাখাও আছে। এটাকে রকেটের মতই উড্ডয়ন করা হয় তবে এটা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পর উড়োজাহাজের মতই রানওয়ে দিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে। এতে যে PAYLOAD-টি থাকে ফিরে আসার পর তাতে আবার নতুন কিছু সংযোজন করা যায়। যেমন একটি কৃত্রিম উপগ্রহ বসিয়ে দেয়া হল এ শ্যাটল-এ। অতঃপর এটা উপগ্রহটিকে মহাকাশে ছেড়ে দিয়ে আসল। আসার পর শূন্য স্থানে অনুরূপ আরো উপগ্রহ বসিয়ে উড্ডয়ন করা যায়। অর্থাৎ এ স্পেস শ্যাটলটি বার বার কাজে লাগানো যায়। এভাবে ব্যবহার করার ফলে শতকরা ৯০ ভাগ খরচ কম পড়ে। ফলে মহাকাশে বিচরণের জন্য মানুষের খরচ করার সামর্থ্যও বর্ধিত হয়।

যদিও আমরা ১৯৮০ সনের পর থেকে স্পেস শ্যাটল ব্যবহার করছি তবুও এর ধারণা কিন্তু অনেক আগেই বিজ্ঞানীরা দিয়ে ছিলেন। উনিশ শত ত্রিশ সনে EUGENA SEINGER নামক একজন অস্ট্রিয়ান বিমান চালক এরকম একটি পাখাযুক্ত পুনঃ ব্যবহারযোগ্য রকেটের কথা বলেন। এতে করে ভাসমান পরীক্ষাগারগুলিতে মানুষ এবং নানারকম জিনিসপত্র পাঠাতে সুবিধা হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকার বিজ্ঞানিগণ উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন রকেট নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। অতপর ১৯৬০ সনে তারা X-১৫ রকেটটি উদ্ভাবন করেন যেটা প্রায় ১০৮ কিলোমিটার উচ্চতায় ওঠে এবং এর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় সাত হাজার কিলোমিটার।

এ X-১৫ রকেটটি কোন নভোচারীকে মহাশূন্যের প্রান্তে নিয়ে কোন কক্ষপথে ছুঁড়ে দিতে পারত। তখন একবার ব্যবহারযোগ্য সাধারণ রকেট দিয়েই তা সম্ভব ছিল। ১৯৬০ সনের দিকে নাসা পাখাহীন গ্লাইডারগুলিকে উড়োজাহাজ হতে ছেড়ে দিয়ে ঠিকভাবে রানওয়েতে নামিয়ে আনার পরীক্ষা করে। অর্থাৎ অরবিট থেকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সময়ে স্পেস শ্যাটল ঠিকভাবে রান-

www.pathagar.com

ওয়েতে অবতরণ করতে পারবে কিনা সেটা জানার জন্যই নাসা এ ধরনের পরীক্ষা-কার্য চালায়।

স্পেস শ্যাটল ।

www.pathagar.com

নাসা ১৯৬৮ সন থেকে স্পেস শ্যাটল এর নক্‌শা করা শুরু করে। এটাতে দুটি ধাপ এবং দুটি পাখা থাকবে। প্রথম ধাপের রকেটটি এটাকে মহাকাশে ছুড়ে দেবে এবং পাখার রকেটগুলি পৃথিবীতে ফেরার জন্য কাজে লাগানো হবে। কিন্তু এরকম দুই ধাপবিশিষ্ট স্পেস শ্যাটল বানাতে যেরকম অসুবিধা সে রকম প্রচুর খরচও রয়েছে। কারণ বুস্টারগুলি মহাশূন্যে চলে যাবে। তাই অবশেষে ঠিক করা হয় যে এ বুস্টারগুলিকে প্যারাসূটের মাধ্যমে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আবার কাজে লাগানো হবে। আর তার ফলে খরচও অনেক কমে যাবে।

অরবিটারটি (মূলযান) এক প্রকার 'ব' আকারের পাখাযুক্ত যানবিশেষ। এটা ৩৭·২ মিটার (১২২·৫ফুট) লম্বা এবং পাখাসহ পাশে ২৩·৩৮ মিটার (৭৮ ফুট) চওড়া। এর সামনের অংশে তিন থেকে চারজন নভোচারীর জায়গা আছে। এতে একটি টয়লেট, ঘুমানোর জায়গা, একটি গ্যালে এবং বসার ঘর থাকে। বেশির ভাগ অরবিটারই যেসব কার্গো বহন করে যেগুলি সাধারণতঃ ১৮·৩ মিটার (৬০ ফুট) লম্বা এবং ৪·৬ মিটার (১৫ ফুট) চওড়া হয়ে থাকে। শ্যাটলগুলি কক্ষপথে ২৯ টন বয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং ১৪·৫ টন পর্যন্ত পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে পারে। এ কার্গো এর দরজা শ্যাটলটি যখন মহাকাশে থাকে তখন একবার খোলা হয়। এ শ্যাটলযানের কাজ হল উপগ্রহকে মহাকাশে নিয়ে কক্ষ পথে ছুঁড়ে দেয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত উপগ্রহগুলিকে মেরামত করা।

এখন দেখা যাক কিভাবে একটি স্পেস শ্যাটল কাজ করে? উড্ডয়নের সময় অরবিটারটি একটি বড় অতিরিক্ত ট্যাংকের সাথে লাগানো থাকে। এ ট্যাংকটি হতেই অরবিটারের তিনটি প্রধান ইঞ্জিনে জ্বালানি সরবরাহ করা হয়। এটার ছোট ইঞ্জিনগুলি ব্যতীত অরবিটারটি কোন জ্বালানি বহন করে না। এ ট্যাংকের দুপাশে আবার দুটি কঠিন জ্বালানি বুস্টার লাগানো থাকে। উড্ডয়নের সময় শ্যাটলের সবকটি ইঞ্জিন চালু হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে শ্যাটলটি উড্ডয়ন করে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪৩ কিলোমিটার উপরে কঠিন জ্বালানি বুস্টার দুটি যায় এবং প্যারাসূটের সাহায্যে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এগুলিকে সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করে আবার জ্বালানি ভরে পরে কাজে লাগানো হয়। এরপর অরবিটার-টির নিজস্ব প্রধান ইঞ্জিন হতে শক্তি গ্রহণ করে মহাকাশে উড্ডয়ন করে।

মহাকাশে কক্ষপথে যাবার আগমূহুর্তেই অতিরিক্ত জ্বালানি ট্যাংকটি অরবিটারটি থেকে বিযুক্ত হয়ে যায়। একমাত্র এ অংশটিকেই পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা

www.pathagar.com

হয় না। এটা বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ ট্যাংকটির ওজন প্রায় তেত্রিশ টন, যাকিনা অরবিটারের পে-লোড অপেক্ষাও বেশি।

অরবিটারটি পৃথিবীতে ফিরে আসার আগে সপ্তাহকাল পর্যন্ত মহাকাশে কাটতে পারে। এটা অপরিবাহী ধাতু দ্বারা আবৃত থাকে। ফলে পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে ফিরে আসার সময় উৎপন্ন তাপ এটার কোন ক্ষতি করতে পারে না। প্রত্যেকটি অরবিটারকে প্রায় ১০০ বারের শত পূর্ণ ব্যবহার করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করেন। ১৯৭৭ সনে একটি অরবিটারের পরীক্ষা মূলক অবতরণের সময় এটাকে একটি জাম্বো বিমানের উপরে বসিয়ে নামানো হয়। প্রথম শ্যাটলটি কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে জন ইয়াং এবং রবার্ট ক্রিপেনকে নিয়ে ১৯৮১ সনের ১২ই এপ্রিল তারিখে।

শ্যাটলের উচ্চ ক্ষমতার অর্থ হল এটা বহুসংখ্যক উপগ্রহ একটার পর একটা মহাকাশে পাঠাতে পারবে। আশা করা যায় যে একবার ব্যবহার যোগ্য রকেটের পরিবর্তে এ শ্যাটলকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগানো যাবে। যাইহোক শ্যাটলটি যে দূরত্ব পর্যন্ত মহাকাশে যেতে পারে তা অপেক্ষা অধিক দূরত্বে উপগ্রহ পাঠাতে হলে কিংবা চাঁদে কোন যান পাঠাতে হলে তখন আরেক ধাপ রকেটের প্রয়োজন হবে। এ নতুন ধাপটিকে বলে SPACE TUG। ফলে বোঝা যাচ্ছে একবার ব্যবহারযোগ্য রকেটের দিন ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে।

———

www.pathagar.com

www.pathagar.com